দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে দেশের সর্বনাশ
— পৃঃ ২৭

বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পিছনে বাম এবং মৌলবাদীরা
— পৃঃ ৩৭

৭৩ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ২৬ এপ্রিল, ২০২১।। ১২ বৈশাখ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

মুখ্যমন্ত্রী কি পশ্চিমবঙ্গকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১২ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৬ এপ্রিল - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

গণতন্ত্রের সম্মানহানির অপচেষ্টা তৃণমূল ও বামেদের ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

হাত-হাতুড়ি-খাম, নতুন দিনের বাম ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

প্রধানমন্ত্রীর পরীক্ষা নিয়ে চর্চার মতো প্রচেষ্টায় পুষ্ট হবে দেশের নবীন নেতৃত্ব ▯ প্রসূন যোশী ▯ ৮

বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১১

রাজনৈতিক চাপে এমন দিশেহারা মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গলা আগে দেখেনি ▯ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ▯ ১৩

মাননীয়া, শীতলকুচির দায় আপনাকেই নিতে হবে ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ১৪

রোহিঙ্গাদের ভারতে শরণার্থী হিসেবে মেনে নেওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে ▯ দুর্গাপদ ঘোষ ▯ ১৬

মমতা কি পশ্চিমবঙ্গকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন ▯ সুজিত রায় ▯ ২৩

রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে দেশের সর্বনাশ ▯ সুকল্প চৌধুরী ▯ ২৭

সর্বজনীন জননী দেবী উমা ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩১

বামন বিষ্ণু প্রতিমার পুনরুদ্ধার ▯ বিপ্লব বরাট ▯ ৩২

বাম, মমতা, কংগ্রেস ও আব্বাসদের মোদী বিরোধিতা বাংলাদেশের জেহাদিদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা ▯ একলব্য রায় ▯ ৩৫

বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পিছনে বাম এবং মৌলবাদীরা ▯ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চক্রান্ত চলছে ▯ সরোজ চক্রবর্তী ▯ ৪৩

গোটা রাজ্যের হিংসার চূড়ান্ত মুখ শীতলকুচি ▯ হীরক কর ▯ ৪৪

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে শ্রীরামের চরিত্র আজও আদর্শস্বরূপ ▯ ড. অনুপম যশ ▯ ৪৫

বাঙ্গলার ভোটে বাঙ্গালিয়ানা বনাম ভারতীয়ত্ব ▯ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ▯ ৪৮

এরাজ্যের রক্তাক্ত নির্বাচন ও জেহাদি আস্ফালন ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৫০

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২

With Best Compliments
from :-

A
Well Wisher

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গ

গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বহুদিন হইতেই রক্তাক্ত হইতেছে। লজ্জার বিষয় হইল, এই রাজ্যে শাসকদলই জল্লাদের ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। রাজ্যবাসী জল্লাদদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শাসক বদল করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে রক্তপাত বন্ধ হয় নাই। এই রক্তপাত তৃণমূল জমানায় শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইবারের নির্বাচনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরিতেছে, নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাইতেছে। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, তৃণমূল দল গঠনের সময় হইতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করিয়া জেহাদি শক্তিকে পুষ্ট করিয়াছেন। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সমগ্র রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবই তিনি করিতেছেন যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য। তাঁহার হঠকারিতায় মানুষ যখন তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে তখন জেহাদি শক্তিকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিতেছেন। তিন বৎসর পূর্বে রানিগঞ্জ ও আসানসোলে রামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদিদের আক্রমণ এবং তাহাতে একজন পুলিশ অফিসারকে প্রাণে মারিবার প্রচেষ্টার কথা কেহই ভুলিয়া যায় নাই। ক্যানিং, ধুলাগড়, বসিরহাট, কালিয়াচকে শাসকদল আশ্রিত জেহাদিদের তাণ্ডব সর্বজনবিদিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় হইতে সমগ্র রাজ্যে দাঙ্গার পরিবেশ নির্মাণ করিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ১৮টি আসন লাভ করিবার পর তিনি রাজ্যের পরিবেশ ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন। ক্ষমতা হারাইবার ভয়ে এইবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে হইতেই তিনি তাঁহার গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের একাংশের সাহায্যে রাজ্যের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য আট দফায় নির্বাচন পরিচালনা করিতেছে। ইহাতে ভোট লুঠ করিবার সুযোগ না থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেহাদি বাহিনী হিন্দুদের ভীতি প্রদর্শন করিয়া ভোটদানে বাধা দিতেছে। শুধু তাহাই নহে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের নিমিত্ত আগত কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইহারই ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মদতপুষ্ট জেহাদিরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করিতেছে। নিজেদের প্রাণ বাঁচাইতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গুলি চালাইতে হইতেছে। কোচবিহারের শীতলকুচিতে ভোট লুঠ করিতে আসা চার জেহাদি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রীকেই লইতে হইবে।

কোনো প্রকারে ভোট লুঠ করিতে না পারিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শীতলকুচির ঘটনাকে তিনি গণহত্যা বলিয়া প্রচার করিয়া মুসলমানদের উত্তপ্ত করিতেছেন। রাজ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া ভোট বানচাল করিতে চাহিতেছেন। ইহার জন্য তিনি শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহত চার দুষ্কৃতীর লাশ লইয়া মিছিল করিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই চক্রান্তের কথা একটি অডিয়ো ক্লিপ ফাঁস হইয়াছে। ফোনে তিনি শীতলকুচির এক দলীয় নেতাকে এই পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন, সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের, স্থানীয় এসপি এবং থানার আইসিকে ফাঁসাইবারও নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, নির্বাচনে জিতিবার জন্য তিনি কত নীচে নামিতে পারেন। সমগ্র দেশ পশ্চিমবঙ্গের এই অধঃপতন দেখিতেছে এবং ধিক্কার জানাইতেছে। ইহাতে সমগ্র দেশ ও বিশ্বের কাছে বাঙ্গালির মাথা নত হইয়া গিয়াছে।

ইতিহাসে বহু স্বৈরাচারী শাসকের নাম রহিয়াছে। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহারা নানা কালাকানুন তৈরি করিয়াছেন, কিন্তু দেশের ভিতরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা গৃহযুদ্ধের কল্পনা তাহারা করেন নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলিতেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতা দেশ বিভাগের পূর্বের জিন্না ও সুরাবর্দির সহিত মিলিয়া যাইতেছে। আশার কথা হইল, এইবারে নির্বাচন কমিশন শক্তহাতে নির্বাচন পরিচালনা করিতেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাতা ফাঁদে মানুষ পা দিতেছেন না। শাসকদলের সন্ত্রাসের মুখেও মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতেছেন ও প্রতিরোধ খাড়া করিতেছেন। প্রতিটি দফায় ৮০ শতাংশ ভোট প্রমাণ করিতেছে ক্ষমতালোভী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদায় আসন্ন। রাজ্যবাসী সেই অপেক্ষায় রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

ধন্যং ধন্যং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।

দর্দুরাঃ যত্র বক্তারঃ তত্র মৌনং হি শোভতে।

বর্ষা আগমনে কোকিলরা গান বন্ধ করে সঠিক কাজই করে। কারণ ব্যাঙেরা যেখানে বক্তা সেখানে চুপ করে থাকাই সমীচীন।

গণতন্ত্রের সম্মানহানির অপচেষ্টা তৃণমূল ও বামেদের

বিশ্বামিত্র

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমত পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে প্রচারে না আসার কথা ঘোষণা করেছেন এবং তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বড়ো জনসভা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় প্রচারের শেষদিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ প্রতীকী প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর এই নিয়ে বাঙ্গলার কিছু তাঁবেদার মিডিয়া মমতা-রাহুল কত দায়িত্বশীল তা প্রচার করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু সত্যিই কি তাঁরা দায়িত্বশীল? প্রশ্নটা উঠবেই। কারণ গত বছর যখন করোনার প্রথম ঢেউ এসেছিল, তখন ক্রমাগত করোনা-সংক্রান্ত তথ্য গোপনের অভিযোগ উঠেছিল মমতা ব্যানার্জির সরকারের বিরুদ্ধে। আজকে ভোটের ময়দানে আর গাজোয়ারি, রিগিং, ছাপ্পা করতে পারছেন না বলে, বরং ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঠিক এই কাণ্ডগুলিই করেছিলেন বলে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন বলে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মানুষ তাঁকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন। ২০২১-এও তা যে আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে বুঝতে পেরে মমতা এখন রাজ্যবাসীর সহানুভূতি পাবার রাজনীতি করছেন, শীতলকুচিতে লাশের রাজনীতি করার চেষ্টা করেছেন। এই ভাবে যদি ভোটের হালে পানি পাওয়া যায়। আর এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয়বাহিনীর ওপর লাগাতার কুৎসা আরোপ করে যাচ্ছেন।

যত সময় যাচ্ছে, মমতা তত বুঝতে পারছেন তার পায়ের তলার মাটি দ্রুত সরছে। তাই পলায়নবাদী-মনোবৃত্তি মমতা এখন করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় ভালো সাজার চেষ্টা করছেন। কথায় না দেখিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজে দেখালে রাজ্যবাসীর অনেক উপকার হতো। সরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীর নিত্য হেনস্থা অন্তত বন্ধ হতো। এবারের নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস ও সংযুক্ত মোর্চার হাল কী সকলেই জানেন। সুতরাং রাহুল গান্ধীর প্রচারে না আসা তাঁর মুখরক্ষার খাতিরেই, শুধু করোনাকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অমিত শাহ খাঁটি কথাটি বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ভোটের রাজনীতির সঙ্গে করোনাকে অহেতুক যুক্ত করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে তো ভোট নেই। তাঁর প্রশ্ন, সেখানে কী করে ছড়াচ্ছে?

আসলে মোদী-জমানায় বিরোধীদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে যেনতেন প্রকারে সরকারের বিরোধিতা করা। করোনা রোধে রাজ্যের যথেষ্ট গাফিলতি আছে, যে কারণেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এত ভয়ংকর আকার নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে যেহেতু বাকিরা বিজেপির চেয়ে কয়েক যোজন পিছিয়ে আছে, তাই ভোট বানচালের নানাবিধ প্রচেষ্টা। যার সাম্প্রতিক নমুনা করোনায় কত মানুষ মারা যাচ্ছে, সে নিয়ে উল্লেখ করে ভোট স্থগিত করার ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়া ইস্তক কেন্দ্রের নির্দেশিকা রাজ্য অমান্য করল কোন কায়েমি স্বার্থে? এমনকী করোনার টিকা বের হওয়ার পরও বিরোধীরা এর কার্যকারিতাকে লাগাতার আক্রমণ করে গেছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী শুধু নির্বাচন উতরানোর দায়ে বলে যাচ্ছেন, আমি কেন্দ্রকে বলেছিলাম, তোমরা টীকাগুলো আমাদের বিনামূল্যে কিনে নিতে দাও, আমরা রাজ্যের মানুষকে ফ্রিতে ওগুলো দিয়ে দেবো। কেন্দ্র তাতেও রাজি হলো না।

মুখ্যমন্ত্রী করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের যাবতীয় দায় কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। বামপন্থীরা মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যতই বিরোধিতা করুক, তাঁরাও নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তোলবার ছলছুতো খুঁজছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব সবার।

সরকারি হাসপাতালে এখন করোনার যে টিকা দেওয়া হয়, সে তো বিনামূল্যে। যারা বেসরকারি ক্ষেত্রে যাবেন, তাদের ডোজ প্রতি আড়াইশো টাকা করে দিতে হবে। আসলে মমতা বিনামূল্যে টিকার খোয়াব দেখিয়ে এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বটা নিজের ঘাড়ে ফেলে ভোট-বৈতরণী পেরোনোর স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ১৩০ কোটি দেশবাসীর কাছে করোনার টিকা পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার দায়বদ্ধ, আমফান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কী পরিমাণ দুর্নীতি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস করেছে সবাই তা দেখেছে। এর পরে একইরকম দুর্নীতি যে করোনার টিকা দেওয়ার সময় হবে না, তার গ্যারান্টি কই? মাঝখান থেকে সেরকম কিছু হলে তার ফল ভুগবেন কেবল পশ্চিমবঙ্গবাসীই নয়, ১৩০ কোটি ভারতবাসীও বটে। তাই টিকা বণ্টনব্যবস্থা কেন্দ্র পুরোপুরি রাজ্যের হাতে না ছেড়ে উচিত কাজই করেছে।

কেন্দ্র করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আটকাতে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যও নিয়েছে শেষপর্যন্ত। কিন্তু রাজ্যের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে এত দেরি হলো কেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নির্বাচনী আদর্শবিধি বলবৎ হলে নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ করে, কিন্তু প্রশাসনের দৈনন্দিন ব্যাপারে কমিশন নাক গলায় না। আসলে মুখ্যমন্ত্রী করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের যাবতীয় দায় কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। বামপন্থীরা মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যতই বিরোধিতা করুক, তাঁরাও নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তোলবার ছলছুতো খুঁজছেন। গণতন্ত্রের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব কিন্তু সবার, এটা বুঝতে হবে। □

হাত-হাতুড়ি-খাম নতুন দিনের বাম

মাননীয় কমরেডগণ,

ফেসবুকে তো আপনাদের সরকার হয়ে গিয়েছে। মহম্মদ সেলিম মুখ্যমন্ত্রী। আব্বাস সিদ্দিকি উপ-মুখ্যমন্ত্রী। আব্দুল মান্নান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নন্দীগ্রাম থেকে জিতে মীনাক্ষী যুব দপ্তর। শিক্ষাটা ঐশীর হাতে যেতে পারে। না, বাকি মন্ত্রিসভাটা বলছি না। কারণ, আর কারও নামই মনে পড়ছে না। মানে চিনি না। চিনে উঠতে পারিনি।

সত্যই বঙ্গ বড়ো রঙ্গে ভরা। কমরেডগণ নিশ্চয়ই এটা মেনে নেবেন যে এই যে জোট সেটা আদৌ কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের নয়। এই জোট তিনজনের। সেলিম-মান্নান-আব্বাস। ভাইজানকে জড়িয়ে ধরে ওঁরাই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অধীর থেকেছেন এবং রয়েছেন দূরে দূরে। বিমানবাবু, সূর্যকান্তবাবুরাও। অথচ জোট চিত্র মজবুত করতে ভাইজান আব্বাস সিদ্দিকির পাশে তো তাঁদের দেখা পাওয়ার কথা ছিল দলের প্রতিনিধি হিসেবে। এত কালের বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের বাদ দিয়ে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট নামের ধর্মনিরপেক্ষ ভাইজান দলের সঙ্গে জোট কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে কমরেড?

মৌলবাদীদের সঙ্গে 'জোট' হবে কী হবে না, সিপিএমে এই প্রশ্ন নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই এই বিতর্ক করে আসছেন কমরেডরা। কিন্তু বারবার ঠিক জিতে গেছেন তাঁরা যাঁরা মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে চান। তবে সিপিএমের একটা গুণ আছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে জোট ভেঙে দলের মধ্যে তাত্ত্বিক বিতর্ক করেন বৌদ্ধিক কমরেডরা। ইতিহাস বলছে আপনাদের যখন যে কৌশলকে প্রয়োজন হয় না, সেটাকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। আবার, প্রয়োজন দেখা দিলে বলে দেন পরিবর্তিত পরিস্থিতি। উদাহরণ চাই?

কেরলে ১৯৮৫ সালে যখন মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট ভেঙে দিয়ে আপনারা বলেছিলেন, মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে জোট বাঁধা একটি ঐতিহাসিক ভুল ছিল। সেই ভুলের দায় এম ভি রাঘবনের উপর চাপিয়ে তাঁকে দল থেকে বিতাড়িত করেছিল সিপিএম। এখন আবার মুসলিম লিগের সঙ্গে কেরলে দোস্তির সম্পর্ক। ১৯৮৫ সালে যে মুসলিম লিগকে সিপিএম 'মৌলবাদী' বলেছিল, পরে আবার নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদেরকেই 'ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

যখন যেটা সুবিধা, সেই নীতি গ্রহণে সত্যি কমরেড আপনাদের জুড়ি নেই। এ ব্যাপারে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকেও এগিয়ে। তাতে অবশ্য অনেক লাভও হয়েছে। তবে আমি বলে রাখছি কমরেড, আব্বাসের সঙ্গে জোট বাঁধাকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলাটা খুব তাড়াতাড়িই দেখা যাবে।

আসলে ক্রমশ রাজনৈতিক অপ্রাসঙ্গিক হওয়া সিপিএম গত কয়েক বছর ধরে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও কিছুই সাধারণ মানুষের কাছে দলকে নিয়ে যেতে পারছে না। সাধারণ মানুষ বলতে ফেসবুক জনতা নয়, খেত-খামারে, কলকারখানায় কাজ করা মানুষ, জনজাতিদের কাছে, সবচেয়ে বড়ো কথা শহর বা গ্রাম নির্বিশেষে গরিব মানুষের কাছে। বামেদের তাঁরা এখন ভিনগ্রহের সংগঠন মনে করে। অথচ একদিন মেহনতি এই মানুষরাই ছিল আপনাদের পুঁজি।

বামদের ভোট কমতে কমতে রাজ্যে গত লোকসভা নির্বাচনে ৭ শতাংশে। তৃণমূল হয়ে তাঁদের বড়ো অংশ গত লোকসভা ভোটে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। তাই আব্বাসই ভরসা। লড়াই-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনসমর্থন ফেরানো অনেক পরিশ্রমের। তার চেয়ে শর্টকাট রাস্তা পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে জোট বাঁধা। মুসলমান ভোট বাঁচাতে পারে বলেই তো এত কিছু। কিন্তু তার ভাগীদার তো তৃণমূলও। সে দল তো গোটা মুসলমান সমাজকেই নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মনে করে। আবার বিজেপি যে একেবারে মুসলমান ভোট পাবে না তাই-বা কী করে বলি। বিহার, উত্তরপ্রদেশের ফল তো অন্য কথা বলছে। এই রাজ্যেও মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ বিশেষ করে মহিলারা কিন্তু পদ্মে আস্থা রাখতে পারেন। সুতরাং, এটা হলফ করে বলা যায়, ২ মে বিধানসভা ভোটের ফল বেরলেই সিপিএম আব্বাসের হাত শুধু ছাড়বে না, দলেরই কোনও নেতাকে এসবের জন্য দায়ী করবে। হতে পারেন তিনি মহম্মদ সেলিম। এটাই তো সিপিএম রাজনীতির অতীত।

কমিউনিস্টরা প্রায় গোটা বিশ্বেই তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কারণ, অনেক মৌলিক প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই কমরেডদের কাছে। আচ্ছা কমরেড, ধর্ম নিয়ে আপনাদের অবস্থানটা ঠিক কী বলতে পারেন? কোনও স্বচ্ছ ঘোষণা আজও শুনিনি। মৌলবাদীদের সম্পর্কে তাদের অবস্থান কখনও স্পষ্ট করতে পারেনি সিপিএম। বহু ক্ষেত্রেই মৌলবাদী দলের সঙ্গে কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে বোঝাপড়া করেছে। বিজেপিকে আপনারা সাম্প্রদায়িক বলেন। কিন্তু রাজীব গান্ধীর আমলে যখন বিজেপির সঙ্গেও তাঁরা গোপন বোঝাপড়া করেছেন, তখন বলা হয়েছিল ক্ষমতায় কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙা দরকার। এখন সেই কংগ্রেসই সিপিএমের সবচেয়ে কাছের বন্ধু।

ফেসবুকের কমরেডগণ দয়া করে পলিটব্যুরোকে প্রশ্ন করুন।

অতিথি কলম

প্রসূন যোশী

প্রধানমন্ত্রীর পরীক্ষা নিয়ে চর্চার মতো প্রচেষ্টায় পুষ্ট হবে দেশের নবীন নেতৃত্ব

পরীক্ষা নিয়ে চর্চার যে অভিনব পারস্পরিক আদান প্রদানের চেষ্টা প্রধানমন্ত্রী শুরু করলেন সেটি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। আজকের ভারতে আমরা এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সেখানে যেমন আছে বিশ্ব রাজনীতির কোলাহল, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা, সেই সঙ্গে রয়েছে রাজ্যগুলির মধ্যে নিরন্তর ঘটে চলা নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জীবন ও জীবিকার সংকট। এই জীবন জীবিকার সংকট ঘনিয়ে এসেছে এক নিদারুণ প্রাণঘাতী 'করোনা' মহামারীর কারণে। এই বিষাদঘন পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে হারাতে বসেছি যা আমাদের জীবনে আশা ও উদ্দীপনাকে টিকিয়ে রাখতে পারত। এরই মধ্যে টিভির পর্দায় হঠাৎই ছাত্রদের জন্য একটা অনুষ্ঠানে নজর চলে গেল। অনুষ্ঠানটিতে স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী ছাত্র সমাজের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপচারিতায় যুক্ত হয়েছিলেন। এই ছাত্ররা বিগত এক বছর ধরে প্রচণ্ড মানসিক টানাপোড়েনের যন্ত্রণা ভোগ করে আসছে। আর এই মুহূর্তে তারা জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষার মুখোমুখি (মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইএসসি, আইসিএসই, সিবিএসই) হয়েছে। তারা যারপরনাই উদ্বিগ্ন। বলতে দ্বিধা নেই প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের জনসমর্থন দীর্ঘদিন পেয়ে আসছেন তাতে আত্ম-পরিতৃপ্তির একটা ভাব সহজেই জন্মাতে পারত। কিন্তু তিনি এই প্রবল জন-গ্রহণযোগ্যতাকে নতুন দিকে গঠনমূলকভাবে প্রবাহিত করে দিলেন। দেশের তরুণদের সংকটের সময়ে কীভাবে নিজেদের উজ্জীবিত করে নতুন পথের সন্ধানে এগোতে হবে খুলে দিলেন সেই দিগন্ত। কীভাবে তারাই দেশের সংকট মুক্তি ঘটাবে নিজস্ব আঙ্গিকের নেতৃত্বের মাধ্যমে সেই ইঙ্গিতই রয়ে গেল। এই সূত্রে মহামারীর মোকাবিলায় দেশের অন্য নাগরিকদের নির্দিষ্ট নিয়মকানুনগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদেরই রাস্তা দেখাতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজনীতির চলতি ও লাভালাভের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের ছাত্র যুবকদের সঙ্গে এমন আন্তরিক আলোচনা ও সমাধানের পথ নির্দেশের প্রচেষ্টা নরেন্দ্র মোদীকে একজন যথার্থ জননেতা করে তুলেছে। তাঁর এই অনুসৃত পথই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের নেতা কেমন হওয়া উচিত তার একটি হাতে কলমে নিদর্শন।

আমরা বরাবরই দেখে এসেছি দীর্ঘসূত্রিতা ব্যাপারটা মোদী মোটেই পছন্দ করেন না। যে কোনো সমস্যার মধ্যে আস্তিন গুটিয়ে নেমে পড়াই তাঁর চরিত্র লক্ষণ। দিল্লির সর্বোচ্চ পদে তাঁর আসীন হওয়ার আগে অবধি 'যেমন চলছে চলুক' —এটাই গৃহীত নীতির জায়গা নিয়েছিল। যে কোনো জটিল বিষয়ে 'চলছে চলুক' নীতিই ছিল কাঙ্ক্ষিত পরিণতি। কিন্তু এই অচলায়তনের ভাঙন শুরু হলো জনধন, ৩৭০ ধারা বিলোপ, জিএসটি চালু, রামমন্দির নির্মাণের সূচনা, Insolvency bankruptcy code কিংবা সীমান্ত ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সীমা লঙ্ঘনকে কড়া দৃষ্টিতে দেখে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার মাধ্যমে। এর থেকে গুণীজন তটস্থ হয়ে উঠলেন। মোদী মানে কোনো কিছুকে তোরঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া নয়, তার সামনা সামনি মোকাবিলা করা। নিজের অর্জিত সুনাম, অধিগত প্রজ্ঞা ও নাগরিকদের ওপর তাঁর গভীর প্রভাব ও তাঁর সিদ্ধান্তের অভিঘাতকে তিনি অতি সূক্ষ্ম কিন্তু অভ্রান্তভাবে প্রয়োগ করলেন যাতে সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। তিনি কিছুতেই তাঁর দায়িত্ব বা ভূমিকাকে ২৪ × ৭ ঘণ্টার রাজনৈতিক নেতার দায়বদ্ধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। থেমে থাকলেন না এমন একজন রাজনৈতিক প্রধান হয়ে যিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানেই নিমগ্ন। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গী হলেন।

এই প্রক্রিয়ায় দেশের মানুষের সঙ্গে সরাসরি একটি দুর্লভ যোগাযোগ সূত্র স্থাপন

করতে তিনি যে সাফল্য পেয়েছেন সেই মূলধনকে যেখানে প্রয়োজন রয়েছে সেখানে প্রয়োগ করলেন। এ বিষয়ে শিশুদের প্রতি তাঁর গুরুত্ব কীভাবে আরোপিত হলো তা দেখা যেতে পারে। প্রত্যেক শিশুই পৃথিবীর যাবতীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার এক অন্তর্নিহিত শক্তি নিয়েই পৃথিবীতে আসে। কিন্তু তবুও আমাদের আধুনিক পরিশীলিত পরিমণ্ডল তাদের সেই প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে বহু সময়েই খর্ব করে দেয়। তাদের নিজস্ব ভাব ভাবনা বা আত্ম প্রতিষ্ঠার কল্পনা থেকে সরিয়ে এনে আমরা তাদের পরীক্ষার তুমুল চাপের পরিবেশে সংলগ্ন করে দিয়ে থাকি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের অনেকেই আমাদের নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষাকে সন্তানদের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলি। বছরের পর বছর ধরে আমাদের বিবেক লাঞ্ছিত হতে থাকে যখন ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার নিদারুণ চাপে ভেঙে পড়ে। বহু সময়েই আত্ম বিনষ্টির পথে যায়। প্রধানমন্ত্রী এই আত্মহনন, বিপথে চলন ও হতাশার বিষয়গুলি ও তার উৎসকেই কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে আনেন। সেগুলির নিরসনে সময় দেন।

কয়েকদিন আগে ভারতের পরিবারগুলি যখন তাদের নৈশ আহার সারার বা টিভি দেখার জন্য প্রস্তুতি সারছিল মোদী সেই সময়েই তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক মত বিনিময়ে মিলিত হন। কোনো রাজনৈতিক আলোচনা নয়, বাৎসরিক পরীক্ষার যে বিক্ষুব্ধ তরণীকে প্রতি বছর ছাত্রদের পার করতে হয়— বিষয়বস্তু ছিল সেটিই। তিনি পরিত্রাণের পথনির্দেশ দিতে চাইছিলেন। এ বিষয়ে অভিভাবকদের প্রশ্ন তিনি নেন। প্রশ্ন নেন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। উত্তরও দেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীলতা ও সমবেদনায়। জীবন মানুষের পথযাত্রায় নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় তার মোকাবিলা করেই যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তিনি তাই বিতরণ করেন ছাত্রদের উপযোগী করে। প্রধানমন্ত্রীর এই পরীক্ষা নিয়ে চর্চা এই প্রথম নয়। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর এই মুখোমুখি বসার পরীক্ষা টানা চার বছরে পড়ল।

পরীক্ষার চাপ, নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ, অভিভাবকদের মনোভাব ও আচরণ এসব নিয়ে কোনো সর্বোচ্চ রাজনীতিবিদ নিবিড় ভাবে মাথা ঘামিয়েছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু অভিভাবক, সন্তান বা শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে যথেষ্ট সমস্যাসংকুল তরুণ পরীক্ষার্থীদের নিয়ে তিনি যে পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করছেন তা বিরলদৃষ্ট। তিনি অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের সঙ্গে প্রজন্ম ব্যবধানকে বাড়তে দেওয়ার জন্য মৃদু তিরস্কার করেন। তিনি সেই সমস্ত প্রশ্নকেই উসকে দেন যেগুলি নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মতো যোগদানকারীরা জানতে সদা উন্মুখ। একই সঙ্গে পরীক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগে পরীক্ষার্থীরা দিন দিন যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তার সমাধানের জন্য বিতর্কের মুখে খুলে দেন। তাদের গোটা জীবনযাত্রাটা যাতে কেবল পরীক্ষামুখী না হয় তাই ছিল তাঁর মূল দৃষ্টিকোণ।

আলোচনার পরিসরটিকে বিস্তৃত করে মূল্যবোধ ও সংবেদনশীলতার প্রসঙ্গ তিনি টেনে আনেন। বাড়িতে থাকা অন্যান্য সাহায্যকারীর সঙ্গে মিশে বিদ্যায়াতনের দেওয়া সিলেবাসের বাইরে গিয়ে তাদের কাছে গল্প শোনা, তাদের মধ্যেই জানার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলা বা ঘরে তৈরি টিফিন আর রেডিমেড junkfood খাওয়ার মধ্যে মজাদার তর্ক তৈরি করা যেতে পারে। চিরাচরিত ১০ বা ১২ ক্লাস পাশ করার পর সঙ্গে সঙ্গে কী করা যেতে পারে যাতে হাতে পয়সা আসে একই সঙ্গে লোকের চোখেও পড়া যায় এই অন্যতম প্রিয় বিষয়ে মোদী অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন।

তিনি জানান সমাজে এমন লোক কমই আছে যারা অভিভাবকদের সরাসরি বলতে পারে যে তোমার জীবনের অচরিতার্থ স্বপ্ন সন্তানের মধ্যে জবরদস্তি সফল করিয়ে তুমি কী গৌরব অনুভব করবে? এই বিষয়টায় নাক গলানো খুবই সংবেদনশীল। কিন্তু মোদী তাতেও মসৃণভাবে প্রবেশ করলেন। এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক লাভালাভের হিসেব ছিল না, এমন অপরিচিত বিষয়েও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ।

আমাদের চারপাশের এক ধরনের সবজান্তা ও স্বঘোষিত জ্ঞানী মোদীর এই প্রক্রিয়াকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষা নিয়ে চর্চা, মন কি বাত কিংবা বিশেষ করে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান নিয়ে লেখা Exam warrior নামের বইটি (যেগুলির সঙ্ঘেরই বিষয়বস্তু) একেবারেই মৌলিক এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলা— যা বাস্তবে কাজে রূপান্তরিত অবশ্যই করা যায়। কোনো আধিভৌতিক সমাধান নয়, রাজনীতির চলতি ও লাভালাভের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের ছাত্র যুবকদের সঙ্গে এমন আন্তরিক আলোচনা ও সমাধানের পথ নির্দেশের প্রচেষ্টা নরেন্দ্র মোদীকে একজন যথার্থ জননেতা করে তুলেছে। তাঁর এই অনুসৃত পথই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের নেতা কেমন হওয়া উচিত তার একটি হাতে কলমে নিদর্শন।

(লেখক ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের চেয়ারপার্সন)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাঁথি জেলার বামুনিয়া গ্রামের স্বয়ংসেবক তথা বাঁকুড়া বিভাগ প্রচারক কেদার মালের মাতৃদেবী শান্তবালা মাল গত ১৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ জোশীর মাতৃদেবী শ্রীমতী সুমতি জোশী গত ১৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

রম্যরচনা

কুকুরকে বিয়ে

এতদিন মনের মতো কাউকে খুঁজে পাননি ব্রিটিশ মডেল ও সাঁতারু এলিজাবেথ হোড। শেষ পর্যন্ত নিজের পোষা কুকুরকে বিয়ে করে বিরল নজির সৃষ্টি করলেন তিনি। তাঁর কুকুরের নাম লোগান। সেই লোগানই এখন হোডের জীবনসঙ্গী।

ব্যারিকেড

পল্টুদার বাবার করোনা হয়েছে। পুলিশ পল্টুদার বাড়ির সামনে ব্যারিকেড লাগিয়ে দিয়ে বলেছে কোনো জিনিসের দরকার হলে তাদের জানাতে। পল্টুদা ইলিশ আর গোবিন্দভোগ চাল পাঠাতে বলায় পুলিশ ব্যারিকেড খুলে নিয়ে গিয়েছে।

বিরিয়ানি

হোটেলের ওয়েটারকে এক ভদ্রলোক বললেন, গতকাল এই হোটেলে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম, কিন্তু কালকেরটা তো খুব ভালো ছিল? ওয়েটার বলল, স্যার, দুটোই তো একই দিনের তৈরি।

উবাচ

"দেশের প্রতি করোনা নিয়ে আপনার চিন্তার জন্য ধন্যবাদ। আমরাও দেশের জন্য একই ধরনের চিন্তাভাবনা করছি। কিন্তু আপনার দলের নেতাদেরও কিছু পরামর্শ দিন যাতে পরিস্থিতি খারাপ না হয় যায়।"

হর্ষ বর্ধন
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীকে মনমোহন সিংহের চিঠির প্রত্যুত্তরে

"দিদি বাঙ্গালার উন্নয়নের সামনে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছেন। নীতি আয়োগের বৈঠকে দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আসেন। একমাত্র দিদি আসেন না। বাঙ্গলার মানুষের জন্য দিদির হাতে সময় নেই।"

অমিত শাহ
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
আসানসোলে নির্বাচনী জনসভায়

"বুথের নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর। সেই দায়িত্ব তারা ভালোভাবেই পালন করছে। বাইরের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের। এতদিন সমাজবিরোধীদের সঙ্গে ওঠাবসা করায় দুষ্কৃতী নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছে পুলিশের।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি
নিউ টাউনের ইকো পার্কে মন্তব্য

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দশ বছর ধরে বাঙ্গলার মানুষকে বোকা বানিয়েছে। কোনও চাকরি নেই, কাজ নেই, শুধু কাটমানির সরকার চলছে পশ্চিমবঙ্গে।

রাজনাথ সিংহ
কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গে বাম ও তৃণমূলের দীর্ঘ অপশাসন প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে

সাধন কুমার পাল

১০ এপ্রিল নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই কোচবিহার জেলা জুড়ে বিশেষ করে শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় সর্বত্র ভয়ের পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে হিন্দু জনবসতিগুলি ঘিরে বোমা বিস্ফোরণ, প্রত্যক্ষ শাসানোর ঘটনা ঘটতে থাকে। খবর আসতে থাকে মুসলমান ঠিকাদাররা হিন্দু শ্রমিকদের ভিন রাজ্য থেকে ভোট দেওয়ার জন্য এই রাজ্যে আসতে দিচ্ছে না। অর্থাৎ যেখানে যেখানে সম্ভব হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতেই দেওয়া হবে না এমন একটি পরিকল্পনা হয়েই ছিল। কারণ হিন্দুরা বিজেপির ভোটার। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে হিন্দুরা প্রতিরোধের মুখে পড়ে ভোট দেয়নি। কিন্তু যেখানে শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়েও হিন্দুরা ভোট দিতে গেছে সেখানেই ব্রেকিং নিউজ তৈরি হয়েছে। ফতোয়া অগ্রাহ্য করে ভোটের লাইনে দাঁড়ানোর অপরাধে আনন্দ বর্মনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১২৬ নম্বর মাদ্রাসা বুথে ফতোয়া অগ্রাহ্য করে ভোট দিতে গেলে বুথের ভিতরে ঢুকে সেই সঙ্গে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয়বাহিনীর উপর হামলা চালায় জিহাদিরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে অবশেষে গুলি চালাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। যাতে মৃত্যু হয় চার জনের।

বাংলাদেশেও জিহাদিরা হিন্দুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দেয় না। সাহস করে ভোট দেওয়ার জন্য জ্বালিয়ে দেওয়া হয় গ্রামের পর গ্রাম। ২০০১ সালে ভোট দেওয়ার অপরাধে একটি হিন্দু পরিবারের অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরতা পূর্ণিমা রানি শীলকে ১০/১২ জন বিএনপির গুন্ডা মিলে ধর্ষণ করেছিল। পূর্ণিমার মা ধর্ষকদের হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করতে থাকে 'বাবা আমার মেয়েটা বয়সে ছোটো তোমরা একজন কইরা যাও।' ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে নৌকা চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য পাকিস্তানি সেনা 'মালাউনের বাচ্চা' হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার ও গণহত্যা সংগঠিত করেছিল। শুধু জয় বাংলা স্লোগান নয় এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মতোই হিন্দুদের ভোটদানে বিরত রাখার প্রয়াস হয়েছিল। ঠিক যেন সেই বাংলাদেশের চিত্রনাট্যই আবার একবার দেখা গেল ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে। পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশে পরিণত করার একটা মরিয়া প্রয়াস চলছে।

রক্তাক্ত হলো রাজ্য বিধানসভার চতুর্থ দফার ভোট। প্রথম ঘটনা শীতলকুচির (পাগলাপীর) লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানটুলি এলাকার। স্থানীয় ২৮৫ নম্বর বুথে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে আনন্দ বর্মন নামে ১৮ বছর বয়সি এক প্রথম ভোটারের। আনন্দর দাদা গোবিন্দ বিজেপির শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ। এলাকাটি মুসলমান-অধ্যুষিত। নির্বাচন এলেই হিন্দু এলাকাগুলিতে শুরু হয় ভীতি প্রদর্শন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দুরা যাতে কোনো ভাবেই অংশ গ্রহণ করতে না পারে তার জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। ১০ এপ্রিল নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই হিন্দু পাড়ায় লাগাতার হুমকি ধমকির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে দিনে ও রাতে নিয়ম করে বোমাবাজি করা হতো। তবে এবার হিন্দুরাও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেজন্য নির্বাচনের দিন ভোরবেলা সমস্ত হুমকি উপেক্ষা করে বুথকেন্দ্রে পৌঁছে গিয়েছিল হিন্দু ভোটাররা। হিন্দুদের এই দুঃসাহস সহ্য হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান করিম মিয়া ভোট চলাকালীন সকাল সাড়ে ৯টার সময় গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বুথের দিকে এগিয়ে আসে। এসে হিন্দু ভোটারদের ছত্রভঙ্গ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের দিকে সরাসরি গুলি চালায়। অনেকেই দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। আনন্দও দৌড়ে পালানোর সময় ওকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। পরে আবার উঠে দৌড়াতে শুরু করলে পিঠে গুলি করা হয়। তাতে আরও কয়েকজন আহত হয় এবং পিঠে গুলি লাগাতে লুটিয়ে পড়ে আনন্দ বর্মন (১৮)। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে আনন্দর মৃত্যুর পরও ওর পরিবারের লোকেরা বুথ ছেড়ে যায়নি। পুত্র শোকাতুরা আনন্দর মা ছেলের মৃত্যুর পর ভোট দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন সবার আগে সমাজ রক্ষার ভাবনা, তারপর নিজের শোক দুঃখ।

গণতন্ত্র বাক্‌স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তীব্র বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশে পরিণত করার প্রয়াস হচ্ছে। সন্দেহ নেই ভয়ংকর সংকটের মুখে পশ্চিমবঙ্গ।

ওইদিন দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শীতলকুচি বিধানসভার আমতলি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ১২৬ নম্বর বুথে। এই এলাকাটিও মুসলমান অধ্যুষিত এবং এই বুথে ৮০ শতাংশ মুসলমান ভোটার। বিগত দশ বছর ধরে ওই গ্রামের হিন্দুরা ভোট দিতে পারেনি। এখানে হিন্দুরা যাতে কোনো ভাবেই ভোট দিতে না পারে তার জন্য নির্বাচনের আগে থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই হুমকি চলছিল। সকাল থেকেই হিন্দুরা দলবদ্ধ ভাবে বুথে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কিছু হিন্দু ভোটার বুথে প্রবেশ করতে সফল হলে জেহাদিরা ক্ষিপ্ত হয়ে বুথের ভিতর ঢুকে হামলা চালায়। কয়েকজন ভোটকর্মী আহত হন। তছনছ করা হয় ভোটিং মেসিন। ভোট দিতে আসার অপরাধে বুথের ভেতরেই একজন মায়ের কোল থেকে তার দুই বছরের শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) ডাকে। ইতিমধ্যেই কুইক রেসপন্স টিমের হাতে মার খেয়ে গ্রামের এক যুবকের অসুস্থ হওয়ার খবর রটিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ভাষণে মমতা ব্যানার্জি হাতা, খুন্তি কিংবা ঘরে থাকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলার কথা বলেন ঠিক তেমনি ওই গ্রাম থেকে মুসলমান মহিলা পুরুষ মিলে প্রায় সাড়ে তিনশো-চারশো মানুষ কুইক রেসপন্স টিমকে ঘিরে মারতে শুরু করে ও তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার তাগিদে প্রথমে তারা শূন্যে গুলি চালায়। তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে সরাসরি গুলি চালায় তাতে চার জনের মৃত্যু হয়।

এদিন বুথে বুথে হিন্দুদের ভোট না দেওয়ার দৃশ্য তৈরি হয়েছে। শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রের খলিসামারী শব্দেরহাট বুথে (৫/১৩৬) প্রায় ২০০ জন হিন্দু ভোটার ভোট দিতে পারেনি। দুপুরে একবার ভোট দিতে আসায় জিহাদি বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তারা ফিরে যায়। ওরা এতটাই ভয় পায় যে পরবর্তীতে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও তারা আর ভোটকেন্দ্রে আসেনি।

ভোট লুটেরাদের মৃত্যুর খবর আসতেই নড়েচড়ে বসে মমতা ব্যানার্জি থেকে শুরু করে মিডিয়া। মিডিয়ার দৌলতে দেখা যায় শীতলকুচির তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় হাই হাউ করে কাঁদছেন। মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করে দিলেন তিনি ১১ তারিখেই শীতলকুচিতে মৃতদের বাড়িতে দেখা করতে আসবেন। মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর যাবতীয় দোষ চাপিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হলো। কেউ বলতে শুরু করল ভোট দিতে আসার সময় নির্দোষ মানুষগুলিকে গুলি করে মারা হলো। বামপন্থীরা তো এই ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলে চালানোর প্রয়াস করলো। এরকম বহুবিধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মিডিয়া ছেয়ে গেল। অর্থাৎ ভোট লুটেরাদের মৃত্যুর জন্য সহানুভূতির বন্যা বয়ে গেল। কিন্তু ভোট লুটেরাদের গুলিতে গণতন্ত্র ও নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থাশীল আনন্দ বর্মনের মৃত্যুর জন্য সহানুভূতির ঝড় উঠলো না। বাঙ্গলার মিডিয়া মমতা ব্যানার্জির ব্যাখ্যা অনুসারণ করে একপেশে খবর করে যাচ্ছে। বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বিবৃতি দেখাচ্ছে। একবারও হিন্দু এলাকায় গিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছে না।

নির্বাচন কমিশনের বাধার জন্য মমতা ব্যানার্জি ভোটের পরেরদিন অর্থাৎ ১১ এপ্রিল শীতলকুচিতে আসতে না পারলেও ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে মাদ্রাসা বুথে মৃত চারজনের পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন। ভোটলুটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপরে আক্রমণের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া এই মৃত ব্যক্তিরা তৃণমূলের হয়ে ভোটলুট করতে গিয়েছিল বলেই কি মমতা ব্যানার্জির এত দরদ? সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের জন্যই এতটা আকুলতা? গণতন্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে ভোট লুটেরাদের গুলিতে মৃত আনন্দ বর্মনের পরিবারের প্রতি কি মুখ্যমন্ত্রী কোনো দায়বদ্ধতা নেই? পুলিশের গুলিতে ইসলামপুরের দাড়িভিটের রাজেশ-তাপসের মৃত্যুর পরও একবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সমবেদনা প্রকাশ করেননি। এখন যারা পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলছেন রাজেশ-তাপসের মৃত্যুর পর সেই অতি বুদ্ধিজীবীরা কেন নীরব ছিলেন? এর থেকে প্রমাণ হয় মমতা ব্যানার্জির ও অতিবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মানবতা বলে কিছু নেই। কারণ মানবতা কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হয় না। উনি যা করেন সবটাই ভোটব্যাঙ্কের জন্য, নিজের প্রত্যক্ষ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে করেন। আমতলি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ১২৬ নম্বর মাদ্রাসা বুথ এলাকা ঘটনার পর থেকেই কার্যত হিন্দু শূন্য। ঘটনার পর থেকেই মুসলমান গুন্ডারা প্রতিনিয়ত হুমকি দিচ্ছে। প্রশাসন ও মিডিয়া কেউ এই দিকটিতে নজর দিচ্ছে না। যা পরিস্থিতি তা এটা আশঙ্কার যে ওই গ্রামে আরেকবার হিন্দু নিধন যজ্ঞ শুরু হয়ে না যায়।

কোচবিহারের এসপি মিডিয়াকে জানিয়েছে, সমস্ত নিয়ম মেনে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। নির্বাচন কমিশনও একই বিবৃতি দিয়েছে। ঘটনায় আহত ভোটকর্মীরা নিজেদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ঘটনা জানিয়েছে। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরাও বলছে সকাল থেকেই হিন্দুদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হয়েছে, ইভিএম মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের কথায় মমতা ব্যানার্জি অভিযুক্ত চার জনকে ক্লিন চিট দিয়ে প্রত্যেকের বাড়িতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক পৌঁছে দিয়ে শহিদের মর্যাদা দিচ্ছেন? তাহলে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে গুলিতে মৃত ভোট লুটেরা মমতা ব্যানার্জির ভোটলুট দলের সদস্য ছিল?

এদিকে মমতার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে কবির সুমন-সহ কিছু বিশিষ্টজন নামধারী প্রতিবাদে নামলেন। কবির সুমনের গলায় ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল বহিরাগত বাহিনীর গুলিতে চলে গেল চার বাঙ্গালির প্রাণ। এতে স্পষ্ট এখানে নাগাল্যান্ড, কাশ্মীরের মতো পশ্চিমবঙ্গের বাইরের ভারতীয়দের বহিরাগত বলা হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি নিজেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকেও বহিরাগত বলেন। এর থেকে স্পষ্ট গণতন্ত্র বাক্‌স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তীব্র বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশে পরিণত করার প্রয়াস হচ্ছে। সন্দেহ নেই ভয়ংকর সংকটের মুখে পশ্চিমবঙ্গ। □

রাজনৈতিক চাপে এমন দিশেহারা মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গলা আগে দেখেনি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

অজিত পাঁজার একটা কথা আজ এই নিবন্ধ লেখার সময় মনে পড়ছে— মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতা চায় কিন্তু ধরে রাখতে পারেন না। এই মন্তব্যের জেরে অজিত পাঁজাকে এক সময় তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হয়েছিল। এক ছোটো গল্পে পড়ছিলাম, সিগনেচার আর ক্যারেকটার সহজে বদলায় না। আমাদের রাজ্যের এ মুহূর্তের কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এ যেন একশোতে একশোই ঠিক। একথা অনস্বীকার্য যে, মমতা ব্যানার্জির মতো বিরোধী নেত্রী ইতিহাসের পাতায় স্থান দখল করবেন কিন্তু পরের পাতাটা যদি প্রশাসকের হয় সেখানে তিনি পাশ মার্কস পাবেন কিনা তা সন্দেহ। কারণ তিনি বিরোধিতাটাই বেশি উপভোগ করেন সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসনের চেয়ে। নির্বাচন কমিশন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। এই নির্বাচন কমিশন অসমের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সেন্সর করে। পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকেও প্রায় একই ভাবে কমিশনের বজ্র আঁটুনিতে ধরা দিতে হয়।

বিগত দিনেও একাধিক উচ্চ নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনের একটু আধটু বকুনি খেয়েছেন। এ তো পথ চলার অঙ্গ। কিন্তু মমতা ব্যানার্জির যে সেই বিরোধী নেত্রীর মতো ধরনায় বসার ঝোঁক এখনও যায়নি তা সত্যিই প্রমাণিত হতো না যদি না নির্বাচন কমিশন ২৪ ঘণ্টার জন্য ওর নির্বাচনী প্রচারে বেড়ি পরাত।

মানুষের মনে মমতা ব্যানার্জির নির্বাচনী যুদ্ধ নিয়ে যে সন্দেহ, সেখানে কোথায় যেন একটা আপ্রাণ চেষ্টা নির্বাচন কমিশনকে নন্দঘোষ বানানো এবং মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করা যে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি সমার্থক। উনি বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করলেন নন্দীগ্রামেও। যে নন্দীগ্রামে ২০০২ সালের পর থেকে একটিবারও যাননি, নন্দীগ্রামের 'শহিদের মা' ফিরোজা বিবিকে প্রার্থী না করে নিজে হলেন বটে। কিন্তু মাটি যে কত শক্ত তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। লক্ষণীয় বিষয়, কাকতালীয় ভাবে মমতা ব্যানার্জির দুর্ভাগ্যজনক ভাবে পায়ে চোট এখানেই। শুরুতেই অকারণ উঠে এল চক্রান্ত তত্ত্ব। কিন্তু রাতারাতি প্রমাণের অভাব এবং স্থানীয় মানুষের ও প্রত্যক্ষদর্শীর চাপে তা রূপান্তরিত হলো অসতর্কতা জনিত দুর্ঘটনায়, যা অহরহ যে কোনো কারোর সঙ্গে ঘটতেই পারে। কিন্তু এমন কী হলো বলুন তো যে ফার্স্ট এইডটাও নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বা তমলুকে দেওয়া গেল না, তাতে যে হুইল চেয়ার তত্ত্ব গড় গড় করে এগোতে পারত না। নন্দীগ্রামের নির্বাচনের ঠিক প্রাক্‌মুহূর্তে নাটকীয় টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন 'বাপ-ব্যাটা' থিয়োরির মাধ্যমে। অর্থাৎ নন্দীগ্রামে সেদিন নাকি পুলিশ গুলি চালায়নি। বামফ্রন্টকে ভালো ছেলে বানিয়ে দিয়ে 'বাপ-ব্যাটা'কে অভিযুক্ত করে ভাবছিলেন যদি অধিকারী পরিবারের প্রতি মানুষের মন বিষাক্ত করা যায়। কিন্তু উনি না নিজেই বলেন নন্দীগ্রামের আন্দোলন উনি করেছেন। তাহলে তাঁর আজকের অভিযোগগুলি সেদিন কি তিনিই অনুমোদন করেছিলেন? নাকি দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে ব্রাহ্মীশাক খেতে খেতে হঠাৎ এই সুফল পেলেন? এই মন্তব্য করে উনি নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামকে ছোটো করলেন না কি? নানান অপ্রত্যাশিত আচরণের মাধ্যমে উনি বরাবর রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু 'আঘাত'টা নন্দীগ্রামেই টের পেলেন। এই আঘাত ব্যাপক ভাবে ব্যালটে পড়বে। কারণ উনি ঘুরিয়ে সেই সব রিপোর্টেই সিলমোহর দিলেন— যেমন, নিশিকান্ত মণ্ডল (তৃণমূল নেতা) সোনাচূড়া পঞ্চায়েত প্রধান, যিনি ২০০৯-এ মাওবাদীদের থেকে ১৮ লক্ষ টাকা নেন। ৬ জানুয়ারি ২০১১ ডেকান হেরাল্ডে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় Maoist in alliance with TMC শীর্ষকে। মমতা ব্যানার্জি কি তা সমর্থন বা অনুমোদন করছেন? কারণ যদি উনি নিজের মতো করে 'বাপ-ব্যাটা' তত্ত্ব দেন, ওটাও হাজারবার বলেছেন যে শুভেন্দু কোনও ফ্যাক্টর নয়। সবার ওপরে ওর (মমতা ব্যানার্জি) ছবি। নন্দীগ্রামকে মমতা ব্যানার্জি সম্মান করেননি বলেই যে সকল পুলিশ আধিকারিকের নাম অপরাধ সংঘটনে জড়িত ছিল— সত্যজিৎ ব্যানার্জি, শেখর রায়, দেবাশিস কয়াল— প্রত্যেকেই পুরস্কৃত। সত্যজিৎবাবু উঁচু স্তরের তৃণমূল নেতা। তাই 'বাপ-ব্যাটা' তত্ত্ব, হুইল চেয়ার ভরসা ক্যাম্পেন, কিংবা ধরনা প্রবণতা ওর রাজনৈতিক অস্থিরতার লক্ষণ। বার বার যেন জানান দিচ্ছে উনি বিরোধী নেত্রীতে পুনর্মুষিক ভব হতে এখন 'এক পায়ে' প্রস্তুত। ভিখারি পাসওয়ান অন্তর্ধান রহস্য যখন বাম আমলে ঘটেছিল তখন মমতা ব্যানার্জির ধরনা প্রতিবাদ মনে পড়ার মতো। কিন্তু উনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী হলে বিচার পায় না তাপসী মালিকের হত্যাকারী। উনি বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন বামেদের দ্বারা অত্যাচারিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর লালু আলমকে ক্ষমা করে দিলেন। ভারতের ইতিহাস বোধহয় প্রথমবার এমন কোনো দৃশ্য দেখল যেখানে একজন পুলিশ কমিশনারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধরনায় বসেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন সিবিআই রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তার করে, তখন কেন মুখ্যমন্ত্রী ধরনায়? এ তো ভারী অদ্ভুত বেমানান এবং 'ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাইনি'-র মতো আচরণ। মোদ্দা কথাটি হলো, এমন অস্থির এবং বিভ্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনও দেখা যায়নি। □

শিতলকুচি কাণ্ডের পর তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি পার্থ প্রতিম রায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন মমত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতা : আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে অভিযোগ দায়ের করো। এসপি, আই-সিকেও ছাড়লে হবে না....

মাননীয়া শীতলকুচির দায় আপনাকেই নিতে হবে

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের শাসক দল ২০২১-এর নির্বাচনে শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসবার জন্য গণতান্ত্রিক রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে এক মৃত্যুযজ্ঞ শুরু করেছে। সেই যজ্ঞে আহুতি দিতে হলো একজন সাধারণ মানুষকে এবং শীতলকুচির ওই বুথে ভোট লুট করতে আসা চারজন দুষ্কৃতীকে।

কোনো মৃত্যুই কাঙ্ক্ষিত নয়, অন্তত এই গণতন্ত্রের উৎসবে। আমাদের রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো ও তাঁর ভাইপো সেই নির্বাচনী প্রচার শুরু হবার দিন থেকেই নিজের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য উস্কানিমূলক কথা বলে একদিকে যেমন নিজের দলের দুষ্কৃতীদের উৎসাহ দিলেন, তেমনি উৎসাহ দিলেন লাশের রাজনীতি করতে।

শীতলকুচির ঘটনা ঘটত না যদি না মাননীয়া তার কয়েকদিন আগে প্রকাশ্য জনসভায় আধা সামরিক বাহিনীকে ঘিরে ফেলে ভোট করার কথা বলতেন। নিরীহ গ্রামবাসীরা মাননীয়ার কূটচালটি বোঝেননি। তাই ভোটের শুরুতেই বহিরাগতরা যখন ঝামেলা সৃষ্টি করল, তারপরেই পিঠে গুলি লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একজন বিজেপি সমর্থক যুবক, তখন শীতলকুচির মানুষ বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন, কী ঘটতে চলেছে।

ভোটের আগের দিন বহু সাংবাদিক শীতলকুচিতে গিয়েছিলেন, সেখানে স্থানীয়দের মধ্যে একটা আনন্দের উৎসবের চেহারা দেখেছিলেন। সেটা যে এভাবে মৃত্যুর উৎসবে পরিণত হবে, সেটা অতিবড়ো ভবিষ্যদ্‌বক্তারাও বলতে পারবে না। একেবারে সাদামাটা একটি গ্রামের মানুষ ভোট উৎসব পালনের আনন্দে মশগুল। অনেকে সকাল সকাল ভোট দিয়ে এসে, আত্মীয় পরিজন নিয়ে পিকনিক মুডে মাতবেন বলে প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। সেখানে এরকম একটি ঘটনা তাঁদের দেখতে হবে, সেটা কল্পনাতেও আনতে পারেননি তাঁরা। অনেকেই বলছেন, এটা নাকি মাননীয়ার একটা গেম প্ল্যান। আমরা অবশ্য এই কথাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছি না। কিন্তু যখন ভাইরাল হওয়া একটি অডিয়ো ক্লিপে মৃত ওই ভোট লুঠেরাদের নিয়ে আপনি নোংরা খেলার কথা বলছেন, তখনই ভাবার জায়গাটাকে একটু হলেও আঘাত করবেই আপনার ভূমিকা নিয়ে।

মাননীয়া, আপনি মানুষ মারার রাজনীতির আবহ তৈরি করছেন না কি? আপনার সাগরেদরাও যে কম যায় না, তাও আপনি হাড়ে হাড়ে জানেন। তাই আপনার প্রিয় ভাই কেষ্ট থেকে শুরু করে সবাই কত রকমের হুমকি দেয়।

মাননীয়া, আপনার কুম্ভীরাশ্রু সবাই দেখে আর বলে, ভিতরে ভিতরে আপনি মৃতদেহ দেখলেই উল্লসিত হয়ে পড়েন। বিরোধী হলে একটি অন্য কারণ দেন আর সাধারণ মানুষ বা আপনার দলের কর্মী হলে সেটাকে নৃশংসতা বলে একটি রাজনৈতিক দলের ঘাড়ে অবলীলায় দোষ চাপিয়ে, নিজের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেন। আপনাকে একটি বিশেষ পাখির সঙ্গে তুলনা করে অসম্মান করতে চাই না। আপনি শ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয় তাই একথা বললাম।

আপনি নাকি রাজ্যবাসীর মা? যারা শীতলকুচিতে মারা গেছে, তাঁরা তো কারোর সন্তান। এই সন্তানহারা মায়ের কোল খালি করার ক্ষেত্রে আপনার উস্কানি কি কোনো কাজ করেনি? আর আধা সামরিক বাহিনীর কথায় আসি, আপনাদের সামাজিক মাধ্যম বা অন্য যেসব মাধ্যমে শীতলকুচির যে ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, সেখানে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, একদল দুষ্কৃতী লাঠিসোটা নিয়ে বুথের বাইরে ভিড় করে ঘুরছিল। মাননীয়া আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ওখানে ১৪৪ ধারা ছিল। ফলে জমায়েত সরিয়ে দেবার ক্ষমতাও পুলিশকে দেওয়া ছিল। তাহলে রাজ্য পুলিশ কার অঙ্গুলিহেলনে ওই জমায়েত করতে দিল? ভিডিয়োগুলিতে দেখা গেছে যে রাজ্য পুলিশের সামনেই ওই জমায়েত। এরপর দেখা গেছে বুথের দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা। ওই বুথের পোলিং অফিসারের একটি বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে, সেটাও প্রকাশ্যে আসার পর সত্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে সেদিনের পরিস্থিতি কী হয়েছিল আর কেনই বা আধা সামরিক বাহিনীকে গুলি চালাতে হয়েছিল। আবারও বলছি কোনো মৃত্যুই কাঙ্ক্ষিত নয়, তবুও এই পাঁচটি প্রাণের বলি আপনার জন্যই, আপনার উস্কানিতেই হয়েছে। মাননীয়া এই রক্তের হোলির পরিবেশ তৈরি করবেন না। জানি ক্ষমতার লোভ আপনাকে ও আপনার ভাইপোকে অন্ধ করে দিয়েছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার রাজনীতি বন্ধ করুন। ◻

‘জওয়ানদের গায়ে হাত তুললে জওয়ানরা গুলি চালাবে’ সঠিক সিদ্ধান্ত

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, ‘ভোটে জওয়ানদের গায়ে হাত তুললে জওয়ানরা গুলি চালাবে। নিঃসন্দেহে কমিশনের এই নির্দেশ নজিরবিহীন এবং অপ্রত্যাশিতও বটে। কেননা ইতিপূর্বে এই রাজ্যে কোনো সময় কোনো ভোটে এরকম কথা কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়নি। এই নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিজস্ব মনগড়া নানা অজুহাত, সংবিধান ধ্বংস বা গণতান্ত্রিক অধিকারের দফারফা ইত্যাদি বহুরকম যুক্তিজাল বিস্তার করে আমজনতাকে গেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এমনকী এর সঙ্গে যে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, নির্বাচন কমিশন গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১০ এপ্রিল কোচবিহারের শীতলকুচির ১২৬ নং ভোট কেন্দ্রে এবং সেখান থেকে ৭ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা থেকে দেওয়া ভাষণ শুনতে হবে। সেই ভাষণে মাননীয়া তাঁর দুধেল গোরুদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো— ‘আপনারা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ধরে রাখবেন। একদল বাহিনীকে ঘিরে থাকবেন, একদল ভোট দেবেন। তাঁরা এসে বাহিনীকে ঘিরে রাখবেন এবং অন্যদল ভোট দেবেন।’ মহিলাদের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন— ‘মহিলারা হাতের কাছে যা পাবেন— হাতা, খুন্তি, বঁটি, ঝাঁটা, তাই নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে ধরবেন।’

মুখ্যমন্ত্রীর সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১২৬নং ভোট কেন্দ্রের দুধেল গাইরা জড়ো হয়ে বুথে ভাঙচুর, ভোটকর্মীদের মারধর, ইভিএম ভাঙচুর করে এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও আক্রমণ করতে পিছপা হয়নি। ওই দিনের ঘটনার সঠিক বিবরণ ১২৬নং বুথের পাশের ১১৮ নং বুথের এক ভোটকর্মীর বয়ান থেকে জানা যাক। তিনি বলেছেন— ‘জরপাটকি স্পেশ্যাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলে ১১৮ নম্বর

বুথে পৌঁছে আমরা আমাদের কাজ করছি। স্থানীয় যুবকরা ঘোরাঘুরি করছে। আমরা খবর পেলাম পাশের ১২৬ নম্বর বুথে ঝামেলা হচ্ছে। ওখানে মোট ৮০০ ভোটারের মধ্যে মুসলমান ভোটার ৬০০ ও হিন্দু ভোটার ২০০। বুঝতেই পারছেন জোরটা ওখানে কার বেশি। আমাদের বুথে ৫০-৫০ প্রায়। এখানে সুবিধা করতে পারছে না। সন্ধ্যে থেকেই খবর আসছে ওই বুথের ২০০ হিন্দু ভোটারকে ভোটদানে বাধা দেওয়ার জন্য ভয় দেখানো হচ্ছে। রাতভর বোমের আওয়াজও পাচ্ছি টুকটাক।

পরদিন ভোর ৫টায় ২০০ মানুষ ভোটের লাইনে। মানুষ আঁচ করতে পারছিল পাশের বুথে গণ্ডগোল হলে ভোট দিতে পারবো না, তাই সকাল থেকেই হিন্দুভোটাররা লাইনে পড়েছে। সেল্ফ হেল্প গ্রুপের দিদিরা জানাচ্ছে, আমাদের ওখানে খুব খারাপ অবস্থা স্যার, গণ্ডগোল হবে।

১২৬-এ সকাল থেকেই যথারীতি হিন্দুদের ভোট দিতে বাধা ও বিরোধী পোলিং এজেন্ট বসতে দেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্য চায়। সেক্টর অফিসার QRT টিম নিয়ে গেলে বচসা হয়। ৩০০-৩৫০ জনের একটি দল সিআইএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে। মহিলা ও শিশুদের ঢাল বানানো হয়। বাধ্য হয়ে শূন্যে দু-রাউন্ড ফায়ার করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে হয়। এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হতে শুরু করলে সিআইএসএফ কমান্ড্যান্ট তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে সেখান থেকে চলে আসে।

আসল ঘটনা এবার। মুসলমানরা সংখ্যায় একত্রিত হয়ে দা, কাটারি, বঁটি, সব নিয়ে সরাসরি বুথে চলে আসে। প্রথমে তারা আশাকর্মী দিদিকে আক্রমণ করে। এরপর বুথের ঠিক সামনে দরজায় দাঁড়ানো রাজ্যপুলিশের লাঠিধারীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় ও বুথে প্রবেশ করে থার্ড পোলিং অফিসারকে মারতে শুরু করে। প্রিসাইডিং অফিসার বাধা দিতে গেলে তার হাত ভেঙে দেয়। এমতাবস্থায় পোলিং পার্সোনালদের বাঁচাতে রিইনফোর্সমেন্ট চলে আসে। একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখবেন, পোলিং পার্সোনালদের জীবন রক্ষা এবং ইভিএমকে রক্ষা ফোর্স-এর প্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব।

এরপর বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএফএস জওয়ানদের রাইফেল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, গুলি তখনো চলেনি। কেন্দ্রীয় বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এমতাবস্থায় ইভিএম রক্ষা, পোলিং পার্সোনালদের জীবন রক্ষা ও ফোর্সদের আত্মরক্ষার জন্য রিইনফোর্সমেন্ট QRT টিমকে গুলি চালাতেই হতো। নইলে পরদিন কাগজে হেডিং হতো দুষ্কৃতীদের হাতে চার পোলিং অফিসারের মৃত্যু।’

ভোটকর্মীর এই বয়ান প্রমাণ করে ১২৬ নম্বর বুথের গণ্ডগোল সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত। ইতিপূর্বে এক নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ নিবাসী শিক্ষক তথা ইটাহারের এক বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পোলিং পার্সোনালরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছিলেন যে তাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পেলে তাঁরা ভোট গ্রহণে অংশ নেবেন না। □

রোহিঙ্গাদের ভারতে শরণার্থী হিসেবে মেনে নেওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে

দুর্গাপদ ঘোষ

ভারত ফের এক নতুন অনুপ্রবেশ সমস্যার কবলে পড়েছে। জুন্টা (মিলিটারি) শাসিত মায়ানমার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চার রাজ্য— মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশের লাগোয়া সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকছে। শেষ খবর পাওয়া অবধি কেবল মিজোরামেই অনুপ্রবেশ করেছে ৩ হাজারেরও বেশি। তাদের মধ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানও রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভারতের স্বারাষ্ট্র মন্ত্রকের সহ-সচিব কৃষ্ণমোহন আপ্পু গত ৬ এপ্রিল উল্লেখিত চার রাজ্যকে নোটিশ পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশ করা লোকেদের যেন 'শরণার্থী' মর্যাদা না দেওয়া হয়। অন্য তিন রাজা তা করলেও কেন্দ্র সরকারের এই নোটিশ নিয়ে মিজোরাম কেবল প্রশ্ন তুলেছে তাই নয়, যতদূর জানা যাচ্ছে যে এই রাজ্যের সীমান্ত জেলা চাম্পাই-এর প্রশাসন ঘোষণা করেছে যে অনুপ্রবেশকারী মায়ানমারীদের শরণার্থী বলে মানা হবে এবং এই জেলায় তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এই জেলা প্রশাসন অনুপ্রবেশকারীদের চাকরিতে ঢোকানোরও পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি মিজোরামের কিছু তথাকথিত সমাজসেবী সংগঠন তাদের জন্য ত্রাণের নামে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কয়েক বছর আগে এই মিজোরাম থেকে হিন্দু জনজাতি রিয়াংদের মেরে কেটে বিতাড়ন করা হয়েছিল। তখন প্রায় ৬০ হাজার রিয়াং তাদের নিজ বাসভূমিতেই পরবাসী হয়েছিল। মিজোরাম সরকার তাদের ফেরত নিতে বা নাগরিক হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়নি। পরে কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপে তা মিটিয়ে ফেলা হয়।

ঘটনা হলো, কাউকে শরণার্থী কিংবা নাগরিকত্ব দেওয়ার অধিকার ভারতের কোনও রাজ্যেরই নেই। সেটা দিতে পারে কেবলমাত্র ভারত সরকার। ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী বিষয়ক সনদ এবং ১৯৬৭ সালে তার প্রটোকল হিসেবে ভারত সরকার পূর্বতন ব্রহ্মদেশ তথা বর্তমান মায়ানমার থেকে আসা কোনো অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিতে বাধ্য নয়। কারণ, ওই কনভেনশনে ভারত কোনো স্বাক্ষর করেনি। অনেকে মনে করেন এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন ব্রহ্মদেশ সরকার বিদেশি প্রশ্নে যখন সেদেশে অভ্যন্তরীণ জাতীয়করণ করেছিল তখন মূল ভারতীয়দের রেয়াত করেনি। তার ফলে অনেক ভারতীয় পরিবারকে যাদের বেশিরভাগই ছিল হিন্দু, তাদের ব্রহ্মদেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়। সেক্ষেত্রে মানবতার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। এবার মায়ানমারে গণতন্ত্রপন্থীদের আন্দোলন দমনে সেনাদের আচরণ যাকে কেউ কেউ 'জুন্টা সন্ত্রাস', 'গণহত্যা' হিসেবে চিহ্নিত করছেন, বর্তমান অনুপ্রবেশের স্রোত তার প্রেক্ষিতে হলেও সেদেশ থেকে দলে দলে ভারতে ঢোকার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে দশকে-দশকে, দফায় দফায়, বারে- বারে কমবেশি তা ঘটেছে। তার মধ্যে ভারতের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হলো রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ। কিন্তু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত

সমাজসেবী মানবদরদি সেজে যেমন 'শহুরে (আরবান) নকশাল'-দের জন্য দরদে গলে যাচ্ছেন তেমনি অনুপ্রবেশকারী সাধারণ মায়ানমার বাসীদের জন্যে তো বটেই এমনকী রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্যও বুক চাপড়াচ্ছেন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুশীল অ্যারন সহ বেশ কিছু নেতা নিরন্তর এদেশে রোহিঙ্গাদের 'শরণার্থী' মর্যাদা দেওয়ানোর জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছেন। এঁদের বক্তব্য, ভারত মানবতাবাদী দেশ, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া ভারতের সংস্কৃতি। সুতরাং কেউ কোথাও নির্যাতিত হয়ে ভারতে এলে তাদের প্রতি মানবিকতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু ঠিক কী কারণে এবং কারা কোন দেশ থেকে ভারতে ঢুকছে, কাদের মূল উদ্দেশ্য কী, কাদের আচার-আচরণের ইতিহাস কেমন সেদিকে এরা চোখে ঠুলি পরে বসে আছেন। কথা হলো, কেউ যদি তাদের নিজেদের দেশের থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী কার্যকলাপের জন্য বিতাড়িত হয় তাহলে তাদেরও ভারতে শরণার্থীর মর্যাদা দিতে হবে?

মায়ানমারে দীর্ঘদিন যাবত গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে। তা দমন করার জন্য মিলিটারি জুন্টা বন্দুকের মুখে দমন নীতি নিয়েছে। গত ২৭ মার্চ মায়ানমারের নেপাইডা শহরে 'সেনা দিবস' পালিত হওয়ার পর থেকে গণতন্ত্রপন্থীদের আন্দোলনের ধার যেমন তীক্ষ্ণ হয়েছে তেমনি তাদের ওপর জুন্টাদের অত্যাচারও তীব্র হয়েছে। কিন্তু সেদেশে শান্তিতে নোবেলপ্রাপ্ত নেত্রী আন সান সু চি-র নেতৃত্বে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ছাড়াও বারে বারে নানা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কখনো কখনো তা বিদ্রোহের চেহারা নিয়েছে। বারে বারে সশস্ত্র হামলা এবং পুলিশ ও সেনা হত্যার ঘটনায় সেনারাও পালটা হামলা চালিয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার ঠিক সাড়ে চার মাসের মাথায় ব্রহ্মদেশও স্বাধীন হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত কারেন-রা সদ্য স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে যাকে সবাই 'কারেন বিদ্রোহ' বলে জানেন। পাশাপাশি স্বাধীনতার আগে থেকে যেসব রোহিঙ্গা মুসলমান ভারতে মুসলিম লিগের মতো ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের জন্য আলাদা বাসভূমির দাবি তুলেছিল ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে তাদের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কখনো কখনো হিংসাত্মক বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। সেনার তরফে গৃহীত হয়েছে পালটা ব্যবস্থা। বার্মিজ মায়ানমার সেনাদের দমনের মুখে বারে বারেই ভারত-মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে কাতারে কাতারে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে। আর ভারতের তথাকথিত মানবতাবাদীরা যারা কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের উপত্যকা থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া নিরীহ মানুষদের জন্য টু-শব্দটিও করেননি, এবারের মতো প্রত্যেক বারই তারা মায়ানমারি বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন। মানবতা লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন কেবল সেনাদের।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতে ৫০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ঘাঁটি গেঁড়ে রয়েছে। তাদের একাংশ জমা হয়েছে পাকিস্তানি মদতে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের গরম তাওয়া জম্মু-কাশ্মীরে। জম্মুতে তাদের একাংশকে পাকড়াও করে ভারত সরকার যখন মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর তোড়জোড় করছে তখন মহম্মদ সলিমুদ্দিন নামে এক রোহিঙ্গা সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। তাঁর বা রোহিঙ্গাদের হয়ে ওকালতি করছেন আইনজীবী তথা আম আদামি পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (পরে দল থেকে বহিষ্কৃত) প্রশান্ত ভূষণ। গত ৮ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীবোবড়েকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ জানিয়েছেন যে মায়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতিতে ধৃত রোহিঙ্গাদের সেখানে ফেরত পাঠানো যাবে না। ভালো কথা! কিন্তু তাদের ফেরত পাঠানোর মতো অনুকূল পরিস্থিতি কবে হবে কিংবা আদৌ হবে কিনা তা কেউ বলতে পারেন না। কেননা, মায়ানমারে নিরন্তরই এরকম উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে। এদিকে রোহিঙ্গাদের ভারত থেকে বিতাড়িত না করা হলে বা না করা গেলে তারা ১৯৪৮ সাল থেকে মায়ানমারে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এসেছে অচিরে ভারতেও যে তা করতে পারে এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

কয়েক বছর আগে ওড়িশার বিজু জনতা দলের এক সাংসদ ভারতীয় সংসদের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে তথ্য তুলে ধরেছিলেন তা রীতিমতো বিচলিত করার মতো। জানিয়েছিলেন যে ভারতে ৪০ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। তাদের কেউ কেউ জম্মু-কাশ্মীরেও আস্তানা গেঁড়েছে, কেউ কেউ পাকিস্তানে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণও নিচ্ছে। পাকিস্তান তাদের সবরকমের মদত দিয়ে ভারতে জঙ্গি সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এরকম একটা মারাত্মক তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরেও এদেশের রোহিঙ্গা দরদিরা তখন এবং এখনও তাদের সমর্থনে গলার শিরা ফুলিয়ে যাচ্ছেন। মুসলমান গরিষ্ঠ বর্তমান বাংলাদেশ সরকার পর্যন্ত সেখানে রোহিঙ্গাদের ঢুকতে এবং থাকতে দিতে রাজি নয়। যে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা সেখানে ঢুকে পড়েছে শেখ হাসিনা সরকার তাদের আলাদা একটা দ্বীপে নিয়ে গিয়ে শিবির গড়ে সাধারণ সমাজ থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা দেখেও এদেশের তথাকথিত মানবতাবাদীদের রোহিঙ্গাদের জন্য এত বেশি আন্তরিকতার পিছনে আসল কারণ কী তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। বলা বাহুল্য, বিপজ্জনকও। এঁরা হয় ভুলে গেছেন নয়তো জানেন না যে কয়েক দশক আগে বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়ার জমানায় জামাত-এ-ইসলামিদের প্রত্যক্ষ এবং খালেদা সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢুকে রোহিঙ্গারা সেখানকার শান্তিপ্রিয় চাকমা বৌদ্ধদের ওপর নৃশংস হামলা করে। নির্মমভাবে মেরে কেটে তাদের উৎখাত করার চেষ্টা চালায়। যার ফলে প্রায় ৩৮ হাজার বৌদ্ধ চাকমা প্রায় এবং তাদের মেয়ে-বউদের অপহরণ ও ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে বাম সরকার শাসিত ত্রিপুরায় পালিয়ে এসে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। চাকমাদের তৎকালীন শীর্ষনেতা শ্যামাচরণ চাকমা একবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রোহিঙ্গা এবং তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করেন। ঘটনা হলো, রোহিঙ্গা এবং তাদের দোসর জামাত-ই-ইসলামিদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে চাকমাদের একাংশ তখন একটা সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল যাদের খালেদা সরকার উগ্রপন্থী সংগঠন বলে চিহ্নিত করে বেআইনি ঘোষণা করে।

মায়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেদেশ থেকে ভারতে ঢোকা লোকেদের জন্য ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত কী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে রোহিঙ্গাদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে না কেন? রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংস্থা শরণার্থীদের ক্ষেত্রে যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তাতে কোনো দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশকারীরা কোনওরকম দুষ্কর্ম, হিংসা ছড়ানো, সমাজবিরোধিতা, সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তাদের শরণার্থী হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে না। যারা নিজেদের দেশে এই জাতীয় কুকর্ম করার জন্য শাস্তি এড়াতে অন্য

দেশে ঢুকবে মানবিকতা প্রদর্শন তাদের জন্য নয়। রোহিঙ্গারা তাদের নিজেদের দেশে অহিংস ও শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধদের সঙ্গে খুনি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কারণে সেখানকার সাধারণ বৌদ্ধ সমাজই তাদের বরদাস্ত করতে রাজি নয়। বাংলাদেশেও যাদের আচরণের ইতিহাস হিংস্র, মানবিকতার খাতিরে ভারতে তাদের শরণার্থী হিসেবে বুকে টেনে নেওয়া হলে তা যে আপ্তবাক্যের দুধকলা খাইয়ে বিষাক্ত সাপ পোষার মতো হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ শাসকরা উত্তর আরাকানের (এখন রাখাইন প্রদেশ) রোহিঙ্গা মুসলমানদের আলাদা একটা হোমল্যান্ড করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দেশ ভেঙে পৃথক দেশ বানানোর সেই দাবির বিরোধিতা করায় বর্তমানে রাখাইনের নিরীহ বৌদ্ধদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায় রোহিঙ্গারা। এককথায় যাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টির মতো ঘটনা ব্রহ্মদেশে ঘটেনি। বৌদ্ধদের তীব্র বিরোধিতার মুখে ব্রিটিশরা তাদের সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের পর বৌদ্ধপ্রধান বার্মা সরকার রোহিঙ্গাদের সেই বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং দাঙ্গার কথা মাথায় রেখে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করে। সদ্য স্বাধীন সরকারের আশঙ্কা ছিল নাগরিকত্ব পেলে রাজনৈতিকভাবে বলিয়ান হয়ে রোহিঙ্গারা দেশ ভেঙে টুকরো করতে পারে। প্রসঙ্গত রোহিঙ্গারা নিজেদের আরব ব্যবসায়ীদের বংশধর বলে মনে করে। মায়ানমারে স্বাধীনতার পর একদিকে কারেনরা যেমন বিদ্রোহ করে অন্যদিকে রোহিঙ্গারা ফের আন্দোলনে নামে এবং তাদের মুজাহিদিনরা সরকারি বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু ১৯৫০ -এর শেষের দিকে এসে পর্যাপ্ত সংখ্যক সমর্থকের অভাবে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। আর ১৯৬১ সালের মধ্যে বেশিরভাগ মুজাহিদ বা জেহাদি সরকারি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তবে সেটা ছিল সাময়িক। ১৯৭০-এর দশকে তারা ফের ময়দানে নেমে পড়ে। তা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন ১৯৭৮ সালে কর্মী সেনাবাহিনী 'বিদেশি বিতাড়ন'-এর নামে 'অপারেশন নাগমিন' অভিযান চালিয়ে তা প্রতিহত করে। আগেই বলা হয়েছে যে সে সময় অনেক ভারতীয়কেও ব্রহ্মদেশ ছেড়ে ভারতে শরণার্থী হতে হয়। এরপর ১৯৯০-এর দশকে 'রোহিঙ্গা সলিসডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও) নামের সংগঠন বার্মা কর্তৃপক্ষের ওপর হামলা শুরু করেন বার্মা সরকার 'অপারেশন ক্লিন অ্যান্ড বিউটিফুল নেশন' নামে অভিযান চালালেও তেমন ভাবে সফল হয়নি। উগ্র ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রোহিঙ্গাদের নিরস্ত্র করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে তারা নিজেদের আরও সংহত ও সংগঠিত করতে থাকে এবং ২০১৬ সালের অক্টোবরে মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত অবস্থিত ৩টে সীমান্ত চৌকি (বর্ডার আউটপোস্ট)-র ওপর সশস্ত্র হামলা চালায় 'হরকত-আল-ইয়াকিন' নামে একটা নতুন সংগঠনের নামে। তাতে দু'পক্ষের অন্তত ৪০ জন নিহত হয়। সে বছরের নভেম্বরে আবারও হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। সেবার মুখ্যত রাকিনের বৌদ্ধদের সঙ্গে সেই সংঘর্ষ শুরু হয় এবং সে বছর সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭ জনে। তার কয়ে মাস পরে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট উগ্রপন্থী 'হরকত-আল-ইয়াকিন' নতুন নামে জঙ্গি সন্ত্রাস শুরু করে ২৪টা পুলিশ চৌকি এবং সেনাবাহিনীর এক কেন্দ্রে হামলা করে। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (এআরএসএ)-র সেই নতুন জঙ্গি বাহিনীর আক্রমণে নিহত হয় পুলিশ এবং সেনা-সহ ৭১ জন। এতে মায়ানমারি জুন্টারা প্রায় খেপে উঠে পালটা ব্যবস্থা নিতেই মানবাধিকার বাদীরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত কমিশনে গিয়ে হাজির হন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই সংস্থা সে বছরের ১১ অক্টোবরের রিপোর্টে বস্তুত সেনাবাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করে।

এ প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা উল্লেখ করা দরকার। সেটা হলো ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই 'রোহিঙ্গা লিবারেশন পার্টি' (আরএলপি) তৈরি করেন এক প্রভাবশালী মৌলবি জাফর কাওয়াল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদদের একত্রিত করে এই পার্টি তৈরি হয় এবং তার সর্বেসর্বা (চেয়ারম্যান) হন কাওয়াল নিজে। ১৯৭৪ সালের মধ্যে তাদের সদস্য সংখ্যা ২০০ থেকে বেড়ে ৫০০ জনে পৌঁছে যায়। তারা চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে অস্ত্রশাস্ত্র আমদানি করে ঘাঁটি গাঁড়ে মায়ানমারের বুথিডাং নামের জঙ্গলে। খবর পেয়ে সে বছরের জুলাই মাসে সেনা অভিযান চালানো হলে কাওয়াল সদলবলে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে ঢোকে। চালাতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের এলাকা দখল। এই প্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে জুন্টা সেনার রোহিঙ্গা-বিরোধী 'অপারেশন নাগমিন'-এর কথা বলা হয়েছে। এসব ছাড়াও সময়ে সময়ে রোহিঙ্গাদের উগ্রবাদী কার্যকলাপ, বৌদ্ধদের ওপর হামলা এবং তা ঠেকাতে সেনা অভিযানের ছোটোখাটো আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে 'রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রন্ট (আর আই এফ), 'রোহিঙ্গা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি' (আরআইএ) ইত্যাদি জঙ্গি সংগঠন গড়ে উঠেছে, ছোটোখাটো হামলা এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কেউ কখনো সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু ২০১৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন সেনাবাহিনীকে দোষী সাব্যস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠার মতো সমালোচনার লাভা উদ্গীরণ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। রোহিঙ্গা প্রীতির বান ডাকিয়ে তাদের ভারত থেকে কোনোমতেই বহিষ্কার করা উচিত হবে না বলে যুথবদ্ধ হয়েছেন। কেউ কেউ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কনভেনশনে ভারতের অবস্থানের কথা না জেনে কিংবা জেনে বুঝেও আন্তর্জাতিক অবস্থানের কথা না জেনে কিংবা জেনে বুঝেও আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই পাড়ছেন।

বহুত্ববাদী এবং মানবতাবাদী ভারত বহু বছর ধরে বহু দেশের বহু নির্যাতিতকে আশ্রয় দিয়ে শরণার্থী এবং পরে নাগরিকত্বের মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার রোহিঙ্গাদের জন্য তা করা যায় না। এটা ঠিক যে অনুপ্রবেশকারী সব রোহিঙ্গাই ওই প্রকৃতির নয়। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে তাদের একাংশ পাকিস্তানে গিয়ে ভারত বিরোধিতার জন্য জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এটা কেবলমাত্র অনুমান নয়, রীতিমতো সরকারি তথ্য। আর এভাবে তারা নিজেরাই ভারতে শরণার্থীর মর্যাদা পাবার যোগ্যতা হারিয়েছে। এখন কোন রোহিঙ্গা সৎ আর কে অসৎ তার বাছবিচার করা সম্ভব নয়। রোহিঙ্গাদের একাংশের আচরণ যদি উগ্রবাদী হয় তবে তাদের শোধরানো এবং নিরস্ত্র ও নিরস্ত্র করার দায় রোহিঙ্গা সমাজেরই। কিন্তু এতদিন ধরে তা তারা করেনি। তাহলে তার ফল তো তাদেরই ভোগ করতে হবে! যাদের গায়ে সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের কালির দাগ লেপ্টে আছে, যারা কোথাও এমনকী মুসলমান বহুল বাংলাদেশেও শরণার্থীর মর্যাদা পাবার যোগ্য নয় তাদের ভারতের মাটিতে ঘাঁটি গাড়তে দিলে তা খাল কেটে কুমির আনার মতো হতে পারে। অন্তত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তাতে ভারত সরকারের তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বাকি বৌদ্ধ তথা গণতন্ত্রপন্থী অন্যান্য মায়ানমারিদের সম্পর্কে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারতে ঢোকা মায়ানমারিদের মধ্যে থেকে রোহিঙ্গাদের ছাঁটাই করে তা করা উচিত হবে। □

শ্যামাপ্রসাদ না সুরাবর্দির এই বাঙ্গলা

এবারের নির্বাচনে বাঙ্গলা কার, তা-ই নির্ণীত হবে। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং করার ষড়যন্ত্রের নায়ক সুরাবর্দি বা নোওয়াখালিতে হিন্দু জেনোসাইডের নায়ক গোলাম সরোয়ারের বাঙ্গলা হয়ে গড়ে উঠবে, না শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলা হয়ে গড়ে উঠবে, তা-ই নিশ্চিত হবে এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে। ছেচল্লিশের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে আজকের এই খণ্ডিত বাঙ্গলায়। জ্যোতি বসুর মতো বিমান বসুও মুসলিম লিগকে শুধু অসাম্প্রদায়িক চেতনার দল বলে ক্ষান্ত হয়নি, হাতও ধরেছে। কেউ কেউ আবার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলপন্থী রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে। এরা কেউ-ই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ পত্র পড়ে, দেশের ও ইসলামিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত বাস্তবতার মুখোমুখি হননি যেমন, তেমনি জানেন না নোওয়াখালিতে হিন্দু জেনোসাইডের নায়ক গোলাম সরোয়ারের সেই দিনের ফতেয়ার কথা। সুচেতা কৃপালনী দুর্গত সংখ্যালঘু হিন্দুদের সেবার জন্য গিয়েছিলেন, অন্য কোনো নামকরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাননি যেমন, তেমনি কোনো অসাম্প্রদায়িক চেতনার মুসলমান নেতাও ইসলামের দ্বারা সংঘটিত হিন্দুদের উদ্ধারের জন্য যাননি।

গোলাম সরোয়ারের সেদিনের ফতেয়া ছিল যে, কোনো ইসলামের বান্দা কৃপালনীকে ধরতে পারলে যেন ধর্ষণ করে। এ নিয়ে কারো কোনো প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না। নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন গান্ধী। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অকংগ্রেসী কুমার চন্দ্র জানার মতো কয়েকজন অবশ্যই ব্যতিক্রম। তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচন যেন কুরু পাণ্ডবের লড়াই। বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে গেছে। বাঙ্গালির সংস্কৃতির আরবীয়করণ, বাংলা ভাষার ইসালামিকরণ রোধ, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের গারদখানা, শিল্পের শ্মশান যাত্রা, কর্মহীন বাঙ্গলা, কাটমানির প্রচলন মুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আজ পরীক্ষা। বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে গেছে এবারের বিধানসভা নির্বাচন।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর পূর্ব মেদিনীপুর।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি রইলো ধিক্কার

২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এখন মাঝপথে। চতুর্থ দফা শেষ হয়েছে। প্রথম তিনটি দফা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে হলেও চতুর্থ দফা নির্বাচন মোটেও শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়নি। হিংসা, রক্তপাত, বোমা, গুলির শব্দ এবং মৃত্যু ও কান্নার আওয়াজে চতুর্থ দফার নির্বাচন হলো। আর এই ভয়াবহ ঘটনার জন্য অবশ্যই দায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোট কুশলী পিকে-র স্ট্রাটেজি অনুযায়ী বাংলা বাণিজ্যিক সিনেমার আদলে পা ভাঙার বা চোট লাগার নাটক করে হুইল চেয়ারে সওয়ারি হয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। হিংসা ছড়ালেন। হিংসায় উস্কানি দিলেন। বেনজির ভাবে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির নেতা ও বিজেপি দলটার মুণ্ডপাত করলেন।

দেওয়ালের লিখন হয়তো তিনি পড়তে পেরেছিলেন যে এবারের নির্বাচনে তাঁর এবং তাঁর দলের ভরাডুবি হতে চলেছে। সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের শীতলকুচি জনসভায় নিদান দিলেন— কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করে রাখার। লাঠি, দা, বটি, ঝাঁটা হাতের কাছে যা পাবেন তাই দিয়ে ঘেরাও করে রাখুন। আর 'গুরুমায়ের' সেই আদেশ পালন করতে গেল শীতলকুচির কিছু দুষ্কৃতী। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং নিজেদের প্রাণ বাঁটানোর জন্য কেন্দ্রীয়বাহিনী গুলি চালায়। ফলস্বরূপ চারজন মারা যায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, যে কোনো মৃত্যুই কষ্টের এবং যন্ত্রণার।

এই মৃত্যুর দায় সম্পূর্ণ ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের। তিনি যদি ওইভাবে উস্কানি না দিতেন, বিদ্বেষমূলক মন্তব্য না করতেন তাহলে এই ঘটনা ঘটতো না। ধিক্কার জানাই বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর ওই ধরনের উস্কানি ও বিদ্বেষ প্রসূত বক্তব্যকে।

—নরেশ মল্লিক,
জামালপুর, পূর্বস্থলী-২, পূর্ব বর্ধমান।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে হিন্দুরা কি কোনওদিনই শিক্ষা নেবে না

হিন্দু আত্মবিস্মৃত জাতি। কারণ ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করে না। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে ভক্তিভরে স্মরণ করলে তিনিই সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। অতীতে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। তবুও হিন্দুদের বিশ্বাসে এতটুকু ফাটল ধরেনি। তাই পারসিক, শক, হুন, পাঠান, মোগল বিদেশি শক্তিগুলি বারংবার এদেশ আক্রমণ করেছে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, দেবস্থানগুলি অপবিত্র করেছে, ধ্বংস করেছে, ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে, হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে আর আমরা হিন্দুরা শুধু বিলাপ করেছি, অশ্রু বিসর্জন করেছি আর নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছি। অথচ অতীত থেকে কোনও শিক্ষা নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিনি।

সাধারণত বৌদ্ধরা খুবই নিরীহ হয়। কিন্তু প্রয়োজন বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তারাও শত্রুদের রেহাই দেয় না। দেশের শত্রুদের দেশত্যাগে বাধ্য করে। উদাহরণ মায়নামারের রোহিঙ্গারা। তারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার, নারী নিগ্রহ প্রভৃতি শুরু করেছিল। ফলে ময়নামারের বৌদ্ধরা যখন পালটা মার দিতে শুরু করল তখন ত্রাহি রব উঠল রোহিঙ্গাদের মধ্যে। জান বাঁচাতে মায়নামার ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল রোহিঙ্গারা। আশ্রয় নিতে শুরু করল বাংলাদেশ,

ফঃ ৩

ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে। রোহিঙ্গারা এখন একটা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বিভিন্ন দেশ সহানুভূতিশীল। আন্তর্জাতিক সংস্থা মায়নামার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে রোহিঙ্গাদের মায়নামারে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মায়নামার সরকার রোহিঙ্গাদের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম। তাই আশা করা যেতে পারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে মায়নামার সরকার তৎপর হবে। কিন্তু আমরা ভারতের হিন্দুরা এমনকী পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে নিজেদের অপহৃতা স্ত্রী- কন্যা-ভগিনীদের মুসলমানদের কবল থেকে উদ্ধার করতে না পেরে কপর্দকহীন অবস্থায় একবস্ত্রে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেওয়া হিন্দুরা এইসব ঘটনাবলী থেকে কোনও শিক্ষা না নিয়ে এখনও স্লোগান দিচ্ছে 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' আর মিটিং-এ গান করছে' একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'। তাই বলছিলাম হিন্দুরা কি স্থির করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তারা কোনো শিক্ষাই নেবে না?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়োবাজার।

হিন্দুদের মধ্যে একতাকে আরও দৃঢ় করার দায়িত্ব নিতে হবে হিন্দুদেরই

হিন্দুস্থান বললে ভারতবর্ষকেই বোঝায়। সমগ্র বিশ্বের দ্বিতীয় কোনো দেশ নেই যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ভারতের মতো। তাই বলে এদেশে শুধুই হিন্দু বসবাস করেন তা নয়, নানান জাতি, নানা ধর্মের মানুষেরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। জীবন জীবিকায় ব্যবসা বাণিজ্যে, সরকারি বেসরকারি কর্মস্থলে প্রতি ক্ষেত্রেই অন্য জাতের ও ধর্মের মানুষেরা বেশি সুবিধে পায়। আরে, রাষ্ট্রের নাম যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র! চীর সনাতনের দেশ, পূজা দেবদেবীর বাসস্থান, মন্দির মসজিদ গীর্জা অনন্ত, মহান মনীষীদের কর্মভূমি, ভেষজ সম্পদ সমাহার, হরিয়ালি ক্ষেত্র, বন্যজন্তুদের অবাধ বিচরণ ভূমি অর্থাৎ 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি / সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি'। এছাড়া সফল বিজ্ঞানী, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, সাহিত্যিক বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতের নাম উজ্জ্বল রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, করোনার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তা সত্যিই নিন্দাজনক। পুলিশ, নার্স, চিকিৎসকদের সঙ্গে যারা অসভ্য ও অমানবিক ব্যবহার করল তাঁরা কি জন্মসূত্রে ভারতীয়? ভাবতে হবে। অঙ্কিত শর্মাকে নৃশংসভাবে খুন করালেন তাহির হুসেন ও গ্যাং। এই খুনিরা কি সত্যিই ভারতীয়? ভাবতে হবে। আবার বিহারের পাটনা শহরে লকডাউনের সময় গুপ্তা পরিবারের বড়ো ছেলেটিকে গুলি করে হত্যা করল চান মহম্মদ, এই অপরাধী কি সত্যিই ভারতীয়? ভাবতে হবে। পালঘরে সন্ন্যাসী হত্যা, গো হত্যা, হাতি হত্যা কেউই ছাড় পাচ্ছে না, এরা কি সত্যিই ভারতীয়? ভাবতে হবে। এরকম সারাদেশ জুড়ে হিন্দু নারী ও পুরুষদের উপর নৃশংস হত্যা হচ্ছে, এর কোনো শেষ নেই? সত্যিই ভারতীয় হলে এত আক্রোশ কেন? হিন্দু ও হিন্দুধর্মের উপর এত রাগ কেন? এই জঙ্গি আক্রমণকারীরা যে ধর্মেরই হোক তাঁরা কি তাদের ধর্মের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখছেন? অনেকেই বলছেন, কেরল ও বাঙ্গলা এই জঙ্গিদের নিরাপদ এলাকা। অবশ্যই, বহুবার এর প্রমাণও মিলেছে। এই সমস্ত রাজ্য থেকেই সাপ্লাই হচ্ছে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কের আঠারো বয়সি ছেলে-মেয়ে। সম্প্রতি, তানিয়া পারভিন নামক মহিলা জঙ্গির কেচ্ছা কাহিনি মিডিয়া ও সংবাদপত্রে ছয়লাপ হলো। কদিন আগে কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত পরিবারের একটি মেয়েকে খুন করা হলো। কারণ এদের মস্তিষ্কে ইসলামিক জেহাদের ষড়যন্ত্র চলছে।

ভারতবর্ষ হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে মামার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। দোষীরা নির্ভয়ে এদেশে থাকতে পারে বিরোধী দলের ছত্রছায়ায়। কং, লাল, সপা, বসপা, তৃণ প্রভৃতিরা এত উদার যে এদের হাতে দেশের কার্যভার সপে দিতে পারলে সেকুলার প্রমাণ করতে পারেন বৈকি। এদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এত হিন্দু নিধন কেন? কেন ধর্মান্তরকরণ, অপহরণ, ধর্ষণ, লাভজেহাদির শিকার হচ্ছে হিন্দু মহিলারা? এর পিছনেও ষড়যন্ত্র রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রীরা কি সত্যিই তাঁদের ধর্মগ্রন্থ পড়েন না? এরা জঙ্গি নেতাদের কথাকে অধিক গুরুত্ব দেন। জঙ্গি নেতারা তাঁদের নিজ ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করে এদের নরম মস্তিষ্ককে ভাজেন এবং নৃশংস কার্যকলাপে কাজে লাগান। আজ সমস্ত বাড়বাড়ন্তের পিছনে আমাদের দেশের বেশ কিছুসংখ্যক সেকুলার হিন্দুদের চোখ বুজে থাকা ও উলটো অস্বীকারোক্তি। মতাদর্শ যাই হোক, আমরা যে যেই দলের সমর্থক হই না কেন, আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা, আত্মোপলব্ধি ও নিজধর্ম বিসর্জন দেওয়া ঠিক নয়।

অতএব, দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলনেতা কর্মী ছাড়াও সাধারণ নিরপেক্ষ জনতা জনার্দন সকলেই চোখ খুলুন, জাগুন এবং ভাবুন এই হিন্দুস্থানকে বাঁচাতে বেরিয়ে আসুন। এই দেশকে রক্ষা করা শুধু নরেন্দ্র মোদীর, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, বাবা রামদেবজী বা দিলীপ ঘোষেদের নয়, এই একশো পঁয়ত্রিশ কোটি দেশের সমস্ত ভারতবাসীর দায়িত্ব পাশাপাশি দায়িত্ব কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলিরও জিতে আসা নির্বাচিত প্রতিনিধির। এরা হিন্দু খুন হলে মুখ খোলেন না, অন্য ধর্মের কেউ খুন বলে উত্তাল করেন সংসদ ভবন। আপনারা বিজেপি ও আরএসএসের সমালোচনা করছেন। হিন্দু হয়ে হিন্দুদের মধ্যে একতায় বিভেদ সৃষ্টি করছেন। এসব ছাড়ুন, হিন্দুদের মধ্যে একতা আরও দৃঢ় করতে দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের সেকুলার হিন্দুদের। তবেই দেশটি বাঁচবে।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

নারী দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

পান্না ঘোষ

প্রথমে যে প্রশ্নটা আমাদের সামনে আসে সেটা হলো— কেন আমরা আলাদা করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম? ৩৬৫ দিনের একটি দিন তো ৮ মার্চ। পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের প্রতিভাকে তুলে না ধরলে পুরুষ তা মেনে নেবে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাইছি। আর সেই পদযাত্রা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে একটু একটু করে। কিন্তু তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়নি।

আমাদের দেশে রাজা রামমোহনের আগে মহিলাদের নিয়ে তেমন চিন্তা ভাবনা কেউ করেননি। সেই সময়কার মহিলাদের কথা, তাদের জীবন যাত্রার কথা ভাবলে আমাদের শিউরে উঠতে হয়। রাজা রামমোহন রায়ই মহিলাদের জন্য প্রথম চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তখনকার সময় আমাদের আর্থ-সামাজিক পদ্ধতিই মহিলাদের উঠে আসার পক্ষে অন্তরায় ছিল। সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কঠোর অনুশাসন ইত্যাদি এমন ভাবে সমাজ শিকড় গেড়েছিল যে তার থেকে মহিলাদের বের করে নিয়ে আসার জন্য দরকার ছিল একজন মনীষীর। আর রাজা রামমোহন রায়ই হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর সদিচ্ছার জন্য ইংরেজ শাসক 'সতীদাহ' প্রথা বিলোপ আইন প্রণয়ন করে।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ দূর করে মহিলাদের শিক্ষিত করার জন্য যাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না তিনি হলেন আর এক মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি যদি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে নারী শিক্ষা সম্ভব করে না তুলতেন, কোথায় থাকত নারীর এই দিগ্‌বিজয়? আরও কতদিন না জানি দেরি হয়ে যেত অশিক্ষার জগদ্দল পাথর সরাতে।

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন নারী শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি এই কাজ নিবেদিতাকে সঁপেছিলেন। অ্যানি বেসান্ত, নিবেদিতা এদেশের নারী শিক্ষা ও উন্নতির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নিবেদিতার স্থাপিত স্কুল আজও উজ্জ্বল ভাবে বর্তমান। এখানে বেথুন সাহেবের স্থাপিত বেথুন স্কুলে বর্তমানে মহিলা কলেজ রূপে আজও গর্বের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। ১৮৫৭ সালে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর সেখান থেকেই ভারতের প্রথম মহিলা যারা যথাক্রমে বিএ, এমএ এবং ডাক্তারি পাশ করেন তাঁরা হলেন প্রিয়ম্বদা দেবী ও কাদম্বিনী দেবী। তাঁদের জন্য আজও প্রকৃত অর্থে আমরা গর্ববোধ করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি মেয়েদের ঘর থেকে বের করার সাহস দেখিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামেও মেয়েদের ভূমিকা অপরিসীম। রানি ঝাঁসী, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতাদের তাই আজও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

ভারতের সংবিধান রচয়িতারাও মহিলাদের জন্য আলাদা চিন্তা ভাবনা করেছেন। তার প্রতিফলন দেখি Directive principles in the constitution of Indian-র 4th part-এর Article No. 45-এ। এখানে বলা হয়েছে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যেন সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পায় সেদিকে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখতে হবে। Article No. 46-এ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি এবং শিশুদের সুকুমার বয়সের অপব্যবহার যাতে না হয় সে জন্য রাষ্ট্রকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আন্তর্জাতিক স্তরেও মেয়েদের উঠে আসাটা দারুণ। সংখ্যায় যতই কম হোক, মেয়েরা এখন দখল করে নিয়েছে কম্পিউটারের টেবিল, অফিসের ডেস্ক, সাংবাদিকের কলম, টেলিভিশনের কারিগরি কুশলতা, নাটকের মঞ্চ, পরিচালকের শিল্প দক্ষতা, ডাক্তারের চেম্বার, এনজিও-র কর্মদক্ষতা, সরকারি অফিসের ফাইল, লেখকের কলম। নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে পা রেখেছে মেয়েরা। এখন জীবনের বেঁচে থাকার নতুন মানে খুঁজে পেয়েছে। শুধুমাত্র থোড়-বড়ি-খাড়া, পরনিন্দা, পরচর্চা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে বাঁচতে শিখেছে।

মেয়েরা এখন সবলা। এখন আর তাদের থামানো যাবে না। যারা মি টু'তে শামিল হয়েছেন হয়তো তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাবে সেলিব্রিটি। অনেকের হারানোর কিছু নেই, তাই তারা সাহস দেখাতে পেরেছেন। তাদের দেখানো সাহসটুকু যাতে একটি সাধারণ মেয়ের সাহসী হয়ে ওঠার প্রেরণা হয়ে ওঠে, তাহলেই ভবিষ্যতে তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। ▯

পরীক্ষার্থীদের স্ট্রেস কমানোর ডায়েটারি টিপস ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

করোনার হুমকির মধ্যেও পরীক্ষা শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে। পরীক্ষার সময়ে সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে সকলেই একটু বেশি বেশি করে পড়াশোনা করে। পড়াশোনায় মনোযোগ আনার জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েটও খুব জরুরি। যে খাবার আপনি খাচ্ছেন তা আপনার শরীরের উপর নানা ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পরীক্ষার সময়ে রেজাল্ট ভালো করার জন্য ও সাবধানে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিক দুদিক ফিট থাকাটা অসম্ভব জরুরি। মস্তিষ্ককে এ সময়ে কর্মক্ষম রাখতে হবে, যার জন্য সমস্ত পুষ্টি উপাদানে ভরপুর ব্যালান্সড ডায়েটের কোনও বিকল্প নেই। পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট ডায়েটপ্ল্যান মেনে চললে একদিকে যেমন স্মৃতিশক্তি তাজা থাকবে, তেমনি পরীক্ষাজনিত মানসিক চাপও অনেকটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

মেনে চলুন নীচের কয়েকটি টিপস :

(১) বাড়িতে তৈরি তাজা খাবার দিয়েই প্রাতঃরাশ সেরে দিনের সূচনাটা করুন। বাইরের খাবার মানে প্রোসেসড ফুড, প্যাকেজড ফুড কিংবা ট্রেটা প্যাকের ফলের রস এগুলিকে বাদ দিন। এ সময়ে চটজলদি তৈরি হয়ে যাওয়া খাবার যেমন চাউমিন, ইন্সট্যান্ট ওটস পরীক্ষার্থীদের না খাওয়াই ভালো।

এই প্যাকেজড খাবারে সিন্থেটিক অণু থাকে, যা শরীর ও মস্তিষ্ক চিহ্নিত করতে পারে না। এর ফলে শরীর জুড়ে অস্বস্তি চলতে থাকে। চিড়ে, সুজির পোলাও, ইডলি, বেসনের চিল্লা এ সময়ে প্রাতঃরাশের ভালো বিকল্প। সেরকম হলে এই গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে দই চিড়ে খেতে পারেন। তবে যা-ই দেবেন তার উপর একটু বাদাম ছড়িয়ে দিন

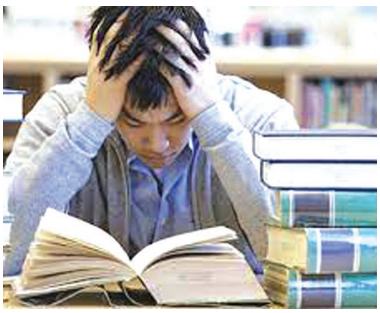

বিশেষ করে চিনাবাদাম বা কাজুবাদাম। এতে এনার্জি বাড়বে, শরীরেও প্রোটিন যাবে। প্রাতঃরাশে এই সময়ে রুটি তরকারির মতো ভারী খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

(২) ডায়েটে অবশ্যই ঘি রাখবেন :

সামান্য হলেও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এ সময়ে দরকার মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সঠিকভাবে পরিচালনা করতে গেলে। ঘি তার মধ্যে অন্যতম। ঘিয়ে বাদামগুলো একটু নেড়ে স্ন্যাক হিসেবে পরীক্ষার্থীরা খেতে পারেন। তবে ঘি খেতে হবে বলেই রুটিতে ঘি মাখিয়ে খাবেন না। এতে হজমের গোলমাল হতে বাধ্য। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড খাবারে যোগ করুন। এতে স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা হয়, আর চেতনাশক্তিরও উন্নতি।

(৩) পেটকে সুস্থ রাখুন দইয়ের মাধ্যমে :

যখন পরীক্ষা কাছে এসে গেছে, তখন মস্তিষ্কের পাশাপাশি পেটের দিকেও সমান নজর দিতে হয়। পেটকে বলা হয় আমাদের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক। এমন খাবার খাবেন যা সহজেই হজম হয়ে যাবে এবং বুকজ্বালা, অ্যাসিডিটি, পেটফাঁপার মতো অস্বস্তি এসময়ে তৈরি করবে না। এগুলি হলে পরীক্ষার্থীদের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের উপরেও চাপ পড়ে। এজন্য দই খান। দইয়ের মধ্যে থাকে প্রোবায়োটিক উপাদান, যা পেটে ভালো ব্যাক্টেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, এগুলি খারাপ ব্যাক্টেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে যে কোনও রকমের সংক্রমণকে কমায়। এছাড়াও এটি মস্তিষ্ক থেকে সেরাটোনিনের ক্ষরণকে বাড়ায়, যা হ্যাপি হরমোন নামে পরিচিত যা স্ট্রেস কমিয়ে মুডকে ভালো রাখে, আর পরীক্ষার সময়ে এটা খুবই দরকার।

(৪) আনরিফাইন্ড সুগার খান : আমাদের মস্তিষ্ক ও শরীরকে এনার্জি প্রদান করতে চিনির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাজেই পরীক্ষার সময়ে একেবারে চিনিকে ছেঁটে ফেলে দিলে বিপদ। তাতে একদিকে যেমন শরীরের এনার্জি লেভেল কমে যাবে, তেমনি মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে আবার উলটো বিপত্তি হবে। তবে আন-রিফাইন্ড সুগার খান। গরমের দিনে লেবুর শরবত বা নুনচিনির জল করে, কিংবা কোনও ডিটস ওয়াটারের সামান্য চিনি যোগ করলেন। এতে শরীর থেকে টক্সিনও বেরোবে, পরীক্ষার্থীদের রক্তশর্করাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

(৫) ভাতের উপরে জোর দিন : রুটির বদলে এই সময়ে ভাতের উপর জোর দিন। ভাতের মধ্যে আছে প্রোবায়োটিক, যা পেটকে হালকা রাখে ও পেট ফাঁপার হাত থেকে বাঁচায়। প্রোবায়োটিকও অন্ত্রের ভালো ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়ানোর সহায়ক। ডালভাত, খিচুড়ি, কার্ড রাইস এই সময়ের জন্য আদর্শ।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : হোমিওপ্যাথি স্ট্রেস কমানোর একটি ভালো ওষুধ আর্জেটামনাইটিকাম, জেলসিমিয়াম, উইদিনিয়া সপনিফোরা, ক্যালিফস প্রভৃতি। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধের শক্তি নির্ধারণ করে থাকেন। যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

মমতা কি পশ্চিমবঙ্গকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন

অনেক বড়ো শঙ্কা। মনে রাখবেন, বিজিত নেত্রী আর পরাজিত নেত্রী একরকম হবেন না। আঁতে ঘা পড়লে ভালো মমতার মন্দ মমতা হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।

সুজিত রায়

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০। যুক্তফ্রন্টের ডামাডোলের রাজ্য শাসন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭। নকশাল রাজনীতির রক্তমাখা অত্যাচার আর কংগ্রেসি ফ্যাসিজমের কদাকার ইতিহাস। ১৯৭৭ থেকে ২০১১— বাম অপশাসনের দুঃস্বপ্ন ঘেরা রাতদিন।

২০১১ থেকে ২০২১--- তৃণমূলি সংস্কৃতির সার্কাস।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য শাসনের এই ৫৪ বছরের ইতিহাসের ৪৬টা বছর কেটেছে রাজ্য শাসনের এক কমন ফর্মূলায়। কেন্দ্রের বিরোধিতা করে জনগণকে 'বিপ্লবী' করে তোলার মোহে আচ্ছন্ন করে দলীয় আখের গোছানো। ভারতের সামগ্রিক স্বার্থ বিরোধী সিপিআইএম-এর নেতৃত্বে রাজ্যের বামদলগুলি ৩৪ বছর ধরে আখের গোছানোর রাজনীতি করে যে নজিরবিহীন 'রাজ্য শাসন'-এর নজির রেখে গেছে, 'বামেদের মনোযোগী ছাত্রী' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘেসো (তৃণমূলি) রাজনীতির তুঘলকি ১০ বছরের জমানায় সে নজিরকেও ম্লান করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক অদৃষ্টপূর্ব রাজ্য শাসনের নমুনা যা শুধু রাজনীতি নয়, রাজ্যের অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি— সব কিছুকেই অধর্মের পথে ঠেলে দিয়েছে অবলীলায়। এবং নিজেই নিজেকে 'সততার প্রতিমূর্তি', 'বাংলার বিবেক', 'বাংলার নিজের মেয়ে', 'বাংলা ও বাঙ্গালির গর্ব' হিসেবে ফ্লেক্সসর্বস্ব প্রভাবে ভূষিত করে ভাই-ভাইপোদের দুর্নীতির চূড়ামণি করে তোলায় ব্রতী হয়েছেন।

ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতিতে এসেছে একুশের নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে এক যুগ সন্ধিক্ষণে। সমস্ত সংশয়, সমস্ত দ্বন্দ্ব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে গোটা রাজ্যবাসী বিশ্বাস করতে শুরু করেছে— পরিবর্তনের রাজনীতিতে একটা নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। ভোট রাজনীতির বিশ্লেষণ বুঝিয়ে দিচ্ছে— কেন্দ্র বিরোধিতার দিন শেষ হতে চলেছে। আখের গোছানোর রাজনীতির নাটকে রাজ্যকে পিছিয়ে দেবার ৫৪ বছরের খেলা শেষ হতে চলেছে। রাজ্যবাসীকে নিয়ে গিনিপিগ টেস্টের

কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহত চারজনের মৃতদেহ।

ইতিহাস এবার কফিনবন্দি হতে চলেছে। এক নতুন শক্তি, নতুন উদ্যম নিয়ে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী পরিবর্তিত সরকার। সেখানে রাশিয়ার মুখাপেক্ষিতা নেই, চীনের, সোভিয়েতের দালালি নেই। সন্ত্রাসী জেহাদি জঙ্গিবাহিনীর কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়ার উদ্যম নেই।

হয়তো এবার সত্যসত্যই পশ্চিমবঙ্গ ফের গোটা ভারতের কাছে অনুকরণীয় একটি সুশাসিত রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে। মানুষ আশাবাদী— শেষ হোক অপশাসন। শেষ হোক অত্যাচার। শেষ হোক দুর্নীতি। শেষ হোক পাগলামি। শেষ হোক বিদেশের পদলেহন। শেষ হোক বিপ্লবের নাটক। শেষ হোক উন্নয়নের নামে ঘুষের রাজনীতি। এবার পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হয়ে উঠুক শিল্পে উন্নত। শিক্ষায় উন্নত। স্বাস্থ্যে উন্নত। কৃষিতে উন্নত, জাতীয়তাবাদে উন্নত। গড়ে উঠুক এক উন্নত পশ্চিমবঙ্গ যেখানে মানুষ অন্তত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে শান্তির দিনযাপন করতে পারবে।

রাজ্যবাসী যখন সেই দীর্ঘ অপ্রাপ্তির পর শান্তির দিনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান তখনই কিন্তু মনের অগোচরে কোথাও যেন গড়ে উঠছে সংশয়— পারব তো আমরা জয়ের পথে হাঁটতে? কোনও কালো শয়তান তার আগ্রাসী রাজনীতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো মানুষের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিতে? সংশয়টা অমূলক নয়। তার প্রমাণ, ভোটপর্ব চলাকালীনই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপচেষ্টার ভুরি ভুরি ভূমিকা যাতে পশ্চিমবঙ্গ মেতে ওঠে গৃহযুদ্ধের আগুনে। ভাইয়ে ভাইয়ে মেতে ওঠে রক্তের হোলি খেলায়।

রাজনীতির ময়দানে সমস্ত বিশ্লেষণবাদীই একথা মেনে নেবেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চরমভাবে বিশ্বাসী এক নেতিবাচক রাজনীতিতে। হরতাল, বনধ, ব্যারিকেড, ধরনা, মিছিল, মানুষ খেপানো বক্তৃতা, মিথ্যা প্রচার, ধর্মনিরপেক্ষতার চাদরে ঢেকে সংখ্যালঘু রাজনীতির ঘৃণ্য বেসাতি— এসবই হলো তাঁর মূলধন। আজীবন এই সস্তার গিমিক রাজনীতিকে আঁকড়েই তিনি ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছেছেন। অন্য দেশ কিংবা অন্য রাজ্য হলে তাঁর মতো রাজনীতিবিদের স্থান কোথায় হতো বলা শক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটুকে ছলচাতুরিময় নেতিবাচক রাজনীতির মোকাবিলা করার মতো দৃঢ়তা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেউই প্রমাণ করতে পারেননি। এমনকী মার্কসবাদী কিংবা মাওবাদীরাও ব্যর্থ হয়েছে। যে ফুলে যে দেবতা সন্তুষ্ট হন সেই ফুলে সব নেতৃত্বকে পুজো করে পার্থিব চাওয়া পাওয়ায় ভরিয়ে দিয়ে তিনি রাজ্যকে কলঙ্কপুরী বানিয়ে তার রানি হয়ে বসেছেন।

২১-এর নির্বাচনে চতুর্থ দফা নির্বাচনের শেষে যখন তিনি স্পষ্ট বুঝে গেছেন, খেলা শেষ, তখন তিনি শুরু করে দিলেন এক নতুন খেলা— যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে যুদ্ধ। নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যুদ্ধ। দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে যুদ্ধ। এবং সর্বোপরি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ। সামাগ্রিক ভাবে এক গৃহযুদ্ধের পথে হাঁটছেন তিনি। উগান্ডার রাওয়ান্ডার গৃহযুদ্ধ, শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ, সিরিয়া কিংবা সুদানের গৃহযুদ্ধের মতো এক রক্তাক্ত ভবিষ্যতের পথে পশ্চিমবঙ্গকে ঠেলে দিতে চাইছেন তিনি। তার জ্বলন্ত প্রমাণ কোচবিহারের শীতলকুচির আমতলী গ্রামের ১২৬ নম্বর বুথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে উদ্দীপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করে ভোট লুটের ঘটনা যার ফলশ্রুতি হলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চার ঘেরাওকারীর মৃত্যু।

২০১৯ সালে মমতা চেয়েছিলেন, বিজেপিকে গালাগাল দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন। ফল হয়েছে উলটো। তাঁর আগে ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীশূন্য রাজনীতির খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। ৩৪ শতাংশ আসনে বিরোধীরা মনোনয়নই জমা দিতে পারেননি। শেষ নির্ভরতা ছিল ২৭ শতাংশ তুষ্টিকরণের মুসলমান ভোট। তাতেও ভাগ বসিয়েছে ভাইজান আব্বাস সিদ্দিকি। আর মমতার তীব্র বিজেপি বিরোধিতা একজোট করেছে হিন্দু ভোটকে। না, বিজেপি নয়। এরাজ্যে প্রথম মেরুকরণের রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এবং আজ তিনি তাঁর নিজের পাতা ফাঁদে বন্দি হয়ে ভারতীয় রাজনীতি থেকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কাল গুনছেন।

ভোটের প্রচারের শুরু থেকেই মমতা স্লোগান তুলেছিলেন, 'খেলা হবে'। তাঁর অন্যতম পারিষদ বীরভূমের হাঁপানি রোগী নেতা অনুব্রত মণ্ডল হুমকি দিয়েছিলেন— ভয়ংকর খেলা হবে। তৃণমূল দল যত ভেঙেছে, যত দুর্বল হয়েছে তার ভিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ততই উগ্র হয়ে উঠেছেন। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার ভোটে সেই আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের শুধু বহিরাগত বলেই ক্ষান্ত

হননি তিনি, কার্যত তিনি বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তুই-তোকারি করা থেকে শুরু করে 'শালা' বলে গালিগালাজ করতেও ছাড়েননি। এই গালাগালির তীব্রতা প্রচারসর্বস্ব রাজনীতিতে যত বেড়েছে, তত পরিষ্কার হয়েছে— তাঁর খেলা শেষ হতে চলেছে। তাঁর বস্তিবাসী জীবনের অতীত, কলতলার রাজনীতির কলুষময় অতীত, নেতিবাচক জীবনযাপনের এক একটা ঝলক প্রতিদিন ফুটে উঠেছে তাঁর ভাষণে। যে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক এতদিন ছিল তাঁর বৈতরণী, এবার তা মুখ ঘোরানোয় তিনি সেই মুসলমানদেরই কাজে লাগাতে চেয়েছেন ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতিতে। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন আগেই--- সোজাসুজি ভোটে জেতার আশা তাঁর নেই। নির্বাচন কমিশনের কড়া দাওয়াইয়ের কোনও ওষুধও তাঁর হাতে নেই। তাঁর অস্ত্র একটাই— ডামাডোল বাঁধিয়ে দাও। ঠিক যেমনটি করেছিলেন— ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই মহাকরণ দখল আন্দোলনের সময়। তাঁর অবিমৃশ্যকারী রাজনীতিই সেদিন কেড়ে নিয়েছিল ১৩টি তরতাজা প্রাণ শহর কলকাতার রাজপথে। এবার শীতলকুচিতে। কারণ তাঁর কথাতেই মুসলমানরা আমতলীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করেছিল ভোট লুটের জন্য। মুসলমান মা-বোনেরা তাঁর উস্কানিতেই বেরিয়ে পড়েছিল হাতা, খুন্তি, দা, বঁটি, শিল নোড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করতে। আত্মরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালাতে বাধ্য হয়। তারপরেও তাঁর মানবিকতা, তাঁর লজ্জাবোধ জাগ্রত হয়নি। নির্বাচন কমিশন ঐতিহাসিকভাবে তাঁকে ২৪ ঘণ্টার জন্য প্রচার করা থেকে ব্যান করার পরেও তিনি ধরনায় বসেছেন নিঃসঙ্গ নেত্রী হিসেবে। গলাবাজি করেছেন রাত আটটায় বারাসাতে। গালাগাল করেছেন সাংবাদিকদের, কারণ তাঁদের অপরাধ তাঁরা সত্যটা তুলে ধরেছেন। কারণ তিনি জানেন না, রাজনীতির ময়দানে কোথায় থামতে হয়। তিনি জানেন না, কোন পরিস্থিতিতে জনগণের কাছে কী বলে দাঁড়াতে হয়। তিনি জানেন না, মেনে নিতে হয় রাজনীতির ময়দানটা তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ময়দানটা জনগণের। সেখানে তিনি একা খেলবেন না। জনগণও খেলেবেন। গোলও দেবেন। হারাবেনও।

ওপরে নিহত আনন্দ বর্মন। নীচে আনন্দের শোকার্ত পরিবার।

এই বাস্তবোচিত জ্ঞানের অভাব আছে বলেই তাঁর ওপর আর আস্থা রাখা যাবে না। একথা নিশ্চিত গত দশ বছরে তাঁর সঞ্চিত অর্থনৈতিক বৈভব এবং রাজনীতির ময়দানে তাঁর ক্লেদাক্ত পরিণতি তাঁকে আরও হিংস্র করে তুলবে। কারণ তাঁর নিজের ভাষায় 'আহত বাঘ মৃত (এটা হবে জীবিত) বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। যতদিন যাবে দল আরও ভাঙবে। ২ মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর গুঁড়ো হয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস। যে সব নেতৃত্বকে তিনি এতদিন ধরে পোষ্য সারমেয় বানিয়ে রেখেছিলেন, বিদ্রোহ করবেন তাঁরাও। হয়তো গোটা দলটাই অপহৃত হয়ে যাবে কিংবা তাঁর দলীয় নেতৃত্বই (হতে পারে তাঁর ভাইপোও) তাঁর থেকে কেড়ে নেবে। ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর জন্য কোনো আসন সেদিন সাজানো থাকবে না। এক চরম দুঃসময় ঘিরে ধরবে তাঁকে। আর তখনই তাঁর হিংস্রতা প্রকাশ পাবে। তাঁর অন্যতম অস্ত্র হবে রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়া। অশিক্ষিত এবং অবুঝ ধর্মীয় আবেগসম্পন্ন মুসলমান, জনজাতি ও বনবাসী সম্প্রদায়ের একাংশকে খেপিয়ে তুলবেন অলীক কল্পনাপ্রসূত রাজনৈতিক ভাষণে এবং রাজ্যের দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবেন দাঙ্গার বিস্ফোরণ। ভ্রাতৃহন্তারক অগ্নিপিণ্ড। কারণ তাঁর নুইসেন্স ভ্যালু তুলনাহীন। তাই কিছু প্রতিবেশী দেশে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর বন্ধুরা— ওই জঙ্গি সন্ত্রাস বাহিনী। কোথাও জামাতের চেহারায়, কোথাও জইসের চেহারায়। কোথাও মাওবাদী সেজে। কোথাও মার্কসবাদী সেজে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাদা মনের মানুষ বলে ভুল করবেন না। করলে ঠকবেন। অনেক বাঙ্গালি মমতার আসন্ন পরাজয়ে হা-হুতাশ করবেন। আফশোস করবেন। কিন্তু তাঁদেরও মনে রাখতে হবে— অতীত কথা বলে। খালপাড়ের রাজনীতি আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঐতিহ্য ও পরম্পরা এক নয়।

একুশের নির্বাচন হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোরস্তান। এটা তিনি নিজেও বুঝে গেছেন বলেই ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ভূমিকায় তিনি সমস্ত তীব্রতাকে ছাপিয়ে যাবেন তা বলাই বাহুল্য। বিশ্বের সমস্ত প্যারালয়েড অটোম্যাটিক শাসকই তাই করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হয় পাগলাগারদে দিন যাপন করেছেন কিংবা বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ চরম অবসাদগ্রস্ত হয়ে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ো সাধ ছিল— তিনিই হবেন ভারতের প্রথম বাঙ্গালি প্রধানমন্ত্রী। বহুবার চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ চেষ্টাটা ছিল— পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একাংশ, সঙ্গে অসম ও ত্রিপুরার কিয়দংশ জুড়ে নিয়ে একটি 'স্বাধীন বাঙ্গলা' গড়ে তুলে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসার। বিশ্ববাংলা নামক লোগোটি কি ছিল সেই ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ?

না। কোনও স্বপ্নই সফল হয়নি। স্বপ্নায়ু মানুষ যখন সব উচ্চাশার সীমা অতিক্রম করে নিজের যোগ্যতার কথা না ভেবে, তখন তাঁর অপমৃত্যু ঘটে। মমতার স্বপ্নেরও অপমৃত্যু আসন্ন। আর সেদিন তিনি চাইবেন--- শেষ হয়ে যাক তাঁর মা-মাটি-মানুষ। শেষ হয়ে যাক পশ্চিমবঙ্গ। পুড়ে ছাই হয়ে যাক সবকিছু। অঙ্গারে পরিণত হোক তাঁর উত্থানভূমি। কারণ এবার ভোটে তাঁর অঙ্ক মেলেনি। তিনি চেয়েছিলেন, প্রতিটি বুথে অন্তত ১০০ ফলস ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন তাঁর সেই খেলা শেষ করে দিয়েছে। ২০১৯ সালে চেয়েছিলেন, বিজেপিকে গালাগাল দিয়ে মানুষের মন জয় করবেন। ফল হয়েছে উলটো। তাঁর আগে ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীশূন্য রাজনীতির খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। ৩৪ শতাংশ আসনে বিরোধীরা মনোনয়নই জমা দিতে পারেননি। শেষ নির্ভরতা ছিল ২৭ শতাংশ তুষ্টিকরণের মুসলমান ভোট। তাতেও ভাগ বসিয়েছে ভাইজান আব্বাস সিদ্দিকি। আর মমতার তীব্র বিজেপি বিরোধিতা একজোট করেছে হিন্দু ভোটকে। না, বিজেপি নয়। এরাজ্যে প্রথম মেরুকরণের রাজনীতির জন্ম দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এবং আজ তিনি তাঁর নিজের পাতা ফাঁদে বন্দি হয়ে ভারতীয় রাজনীতি থেকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কাল গুনছেন।

শেষ চেষ্টা করবেন। করবেনই। কারণ তিনি ভাঙেন কিন্তু মচকান না। পা মচকানোর নাটক করে গোটা ভোটটা হুইল চেয়ারে চেপে সহানুভূতির ভোট আদায়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্বংসাত্মক মনোভাব কিন্তু এখনও যথেষ্ট সতেজ এবং প্রবল। বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি বলেছিলেন— 'Men will not look at things as they really are, but as they wish them to be--- and are ruined.' মমতা হলেন এমন মানগোষ্ঠীভূত যাঁরা বাস্তবটাকে বাস্তব বলে মেনে না নেওয়ার জন্যই ধ্বংস হয়ে যান। এ ধরনের মানুষ ছোটো করে কিছু ভাবতে পারেন না। কিন্তু মুশকিল হলো বড়ো কোনও ভাবনাকে ইতিবাচক করে তোলার মতো আত্মিক শক্তিও এঁদের থাকে না।

মমতা হলেন মানবগোষ্ঠীর সেই বিশেষ প্রজাতিভুক্ত যাঁরা মনে করেন, বিশ্বাস করেন, আত্মিক উন্নয়নের চেয়ে আত্মহত্যাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। হাজার চেষ্টাতেও তাঁদের সঠিক পথে ফেরানো যায় না। ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরও পারেননি। তাঁরও আগে পঙ্কজ ব্যানার্জির মতো সিনিয়র নেতারা চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়েছেন। মুখে না বললেও, হাবেভাবে অনেকেই চেষ্টা করেছেন— ইতিবাচক রাজনীতির দিকে তাঁকে টেনে আনতে। সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল রাজ্যের মানুষের। না হলে ২০১১ এবং ২০১৬-র নির্বাচনে জয়ের মুকুট তাঁর মাথায় উঠত না। কিন্তু তাঁর বোধশক্তি এতই স্বল্প যে মানুষের নেতা হয়েও মানুষের ইচ্ছেটা অনুধাবন করেননি।

এবারও করবেন না নিশ্চিত। যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই এরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে গুটিয়ে নিতেন শামুকের মতো। অপেক্ষা করতেন সুসময়ের। কিন্তু মমতার মতো রাজনৈতিক নেত্রী (ব্যক্তিত্ব বলছি না)-র ধৈর্য এতটাই কম যে তিনি অপেক্ষার ধার ধারেন না। আর তাই ১৯৯৩-তেই ছুটেছিলেন মহাকরণ দখল করতে। এবারও যখন নির্বাচনী হাওয়া বুঝিয়ে দিচ্ছে বিজেপির ঝড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবেন মমতা, তখনও তিনি বলছেন— এবার যুদ্ধ দিল্লি দখলের। কী বলবেন?

বলার কিছু নেই। কিন্তু ভাববার আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাদা মনের মানুষ বলে ভুল করবেন না। করলে ঠকবেন। অনেক বাঙ্গালি মমতার আসন্ন পরাজয়ে হা-হুতাশ করবেন। আফশোস করবেন। কিন্তু তাঁদেরও মনে রাখতে হবে— অতীত কথা বলে। খালপাড়ের রাজনীতি আর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঐতিহ্য ও পরম্পরা এক নয়। এক চরম গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় কম্পমান গোটা রাজ্য। বাঙ্গালি ভয়ার্ত, শঙ্কিত— ভোট-পরবর্তী বাঙ্গলা শান্ত থাকবে তো? বাঙ্গলার উন্নয়ন হবে তো নির্বিঘ্নে?

অনেক বড়ো শঙ্কা। কারণ, মনে রাখবেন, বিজিত নেত্রী আর পরাজিত নেত্রী একরকম হবেন না। আঁতে ঘা পড়লে ভালো মমতার মন্দ মমতা হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক)

With Best Compliments from :

A
Well Wisher

রাজ্যের ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে দেশের সর্বনাশ

সুকল্প চৌধুরী

চেঙ্গিস খাঁ থেকে শুরু করে হিটলার, ইদি আমিন, মাও, লেনিন, জি পিয়াং সকলেই সাম্রাজ্যবাদী ও মানবতার চরম বিরোধী। দানব স্বভাবের এই হত্যাকারী একনায়কদের ভেতর একটাই মিল তারা কখনই নিজের দেশের সর্বনাশ চায়নি। অন্তত নিজে ক্ষমতা ধরে রাখতে দেশের ক্ষতি কেউ করে না। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নজির মিলবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখছেন যে ভাবেই হোক ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যের তথা দেশের সর্বনাশ করে চলেছেন ৬৫ বছরের প্রৌঢ়া— স্বঘোষিত 'বাংলার মেয়ে'।

কলকাতায় এখনও অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক সাংবাদিক আছেন। রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের সময় থেকে সাংবাদিকতা করেছেন। কালের নিয়মে তাঁরা কিছুটা শারীরিক অসুস্থ হলেও মস্তিষ্ক সজাগ। তাঁদের চোখে স্বাধীনতার পর থেকে সব থেকে ক্ষমতালোভী হলেন জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, মুলায়ম সিংহ যাদব, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ যাদব ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নেতা নেত্রীদের ভেতর প্রথম থেকেই সরাসরি মুসলমান তোষণ করেছেন নেহরু, মুলায়ম ও বাংলার মেয়ে। কলকাতার প্রবীণ সাংবাদিকদের মতে তোষণের বেহায়াপনায় সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেত্রীর এই মুসলমান তোষণ এখন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার মুখে বলে ভাবছেন প্রবীণ সাংবাদিকরা। সবাই জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব হিসেব কষে জননেতা লালকৃষ্ণ আদবানীজীর হাত ধরে অটলজীর মন্ত্রীসভায় গুরুত্বপূর্ণ রেল দপ্তরের দায়িত্ব পান।

বারুদের ওপর রাজ্য। নৈহাটিতে বিস্ফোরণ (ফাইলচিত্র)

মন্ত্রী হয়েও অবশ্য বারবারই তিনি পদত্যাগের নাটক করেছেন। পদত্যাগ করে অনেকদিন মন্ত্রীসভার বাইরেও ছিলেন। পরে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে তৃণমূল নেত্রী ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আসার চেষ্টা করেন। বহু অনুনয়ের পর তাঁকে ফিরিয়ে এনে কয়লা মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে মনমোহন সিংহ মন্ত্রীসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রকের দায়িত্বে ছিলেন। এই দফায় প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁকে প্রচুর সহায়তা করেছিলেন।

দীর্ঘ বাম শাসনে রাজ্যের তিতিবিরক্ত মানুষ কোনও বিকল্প না পেয়ে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন। ক্ষমতা পেয়েই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতায় টিকে থাকতে মুসলমান তোষণের বন্যা বইয়ে দেন। সরকারি হিসেব অনুসারে বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রথম তিন বছরে অন্যান্য অপরাধের বিষয় বাদ দিলেও খুনের ঘটনা ঘটেছে ২৩৪টি, ধর্ষণ করে খুন ৮টি, ধর্ষণ ৬৮টি, ধর্ষণের চেষ্টা ৩৭৬টি, ডাকাতির ফলে গুরুতর জখমের সংখ্যা ৯৩১ জন, রাজনৈতিক সংঘর্ষ ৮৪৬টি। এই সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ২৯৭৬ জন। কেবলমাত্র এইসব ঘটনায় ১৮৬৯২ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর ভেতর পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, ধুপগুড়ি, বেলাকোবা,

বিরোধীদের খতম করাই লক্ষ্য। এভাবেই বিরোধী নেতা-কর্মীদের মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে (ফাইলচিত্র)।

সরকারের উদাসীনতায় রাজ্যে অবাধ জঙ্গিরা। সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা কিছু জঙ্গি। (ফাইলচিত্র)

বসিরহাট, উলুবেড়িয়া আছে। অভিযুক্তদের ভেতর ১৪০২৬ জন মুসলমান। তাদের ভেতর ১০৪২৩ জনকে আটক করা হয়েছিল। কামদুনি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত-সহ মাত্র ৩৪১ জন এখন জেল হাজতে আছে। বাকিরা জামিনে মুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ নাকি মেলেনি। তবে ধৃত দু' হাজারের বেশি আটক হিন্দু অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ দাখিল করেছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সমতুল্য এই রাজ্যের পুলিশ। এইসব অপরাধের ভেতর অনুপ্রবেশ, গোরু, বালি, কয়লা, মানুষপাচার ধরা হয়নি। এই পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার তোষণের পালে কত বাতাস লেগেছে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও মানুষ মনে করেন অভিযুক্ত বা অপরাধীদের নিয়ে ধর্মীয় বিচার হয় না। কিন্তু পার্কস্ট্রিট কাণ্ড ছোটো ঘটনা বা কামদুনির প্রতিবাদকারী মহিলারা মাওবাদী— এই তত্ত্বের আবিষ্কারকের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর অপরাধীদের ধর্মের বিচার করতেই হয়। প্রবীণ সাংবাদিকদের মতে 'খেলাটা' এখানেই বিপজ্জনক। কারণ ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত রাখতে মুসলমান মাত্রই সহজ সরল নিরাপরাধ এবং ধর্মপ্রাণ, এমন বার্তা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুসলমানদের গায়ে অপরাধীর তকমা লাগতেই পারে না। ফলে গত বছর দুর্গা পূজার অষ্টমীর সন্ধ্যারাতে মহেশতলার মোমিনপুর ব্রিজে মুসলমান ছেলেরা হিন্দু মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি করতে পারে। এর প্রতিবাদ হলে পুলিশের মদতে উলটে প্রতিবাদকারীদের উপর হামলা চালায় অপাধারীরা। জখম হন চারজন প্রতিবাদকারী। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর অপরাধে এই প্রতিবাদকারীদের আটক করে পুলিশ। তাঁরা এখন জামিনে মুক্ত। সাম্প্রতিক সময়ে শীতলকুচির জোরপাটকিতে ভোট লুঠ করতে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গত কারণে গুলি চালালে চারজন মারা যায়। ঘটনাচক্রে মৃতরা সবাই মুসলমান। এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ বিজেপি নেতারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি শীতলকুচি কেন্দ্রের অপর একটি বুথে ভোট দিতে এসে বিজেপির তরুণ কর্মী আনন্দ বর্মন তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন। এই ঘটনারও শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতারা। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা মুসলমানদের স্বঘোষিত ত্রাণকর্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও হেলদোল নেই আনন্দকে নিয়ে। ভোটের বাজারে নাম কুড়োতে নিহত আনন্দের পরিবারকে সাহায্য দিতে চেয়েছিলেন মমতা। কিন্তু আনন্দের বিজেপি সমর্থক পরিবার সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই দুটি খুব সামান্য উদাহরণ। গত দশ বছরে এই ধরনের ঘটনা অসংখ্য। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী মনে করেন আকাশের যত তারা আছে হয়তো কোনও দিন গোনা যাবে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের অপরাধের সংখ্যা গোনা যাবে না।

প্রবীণ সাংবাদিকরা মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটব্যাঙ্ক বাড়াতে তোষণ করতেই পারেন। কিন্তু তাতে আখেরে দেশের ক্ষতি। এই সাংবাদিকদের মতো সকলেই বোঝেন, মুসলমানদের ভেতর বড়ো একটা অংশ ভারত আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরির আগ্রাসনের সময় থেকে এখনও পর্যন্ত এই দেশকে নিজের দেশ বলে কোনও দিনও মনে করেননি। প্রথম থেকেই তারা ভারত বিরোধী। এর সামান্য ব্যতিক্রম হয়তো আছে। কিন্তু দেশবিরোধীদের সংখ্যাই বেশি। মুসলিম লিগের প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল 'টোটাল ইন্ডিয়া মাস্ট বি এ মুসলিম কান্ট্রি'। সেই মত পোষণ করে মিম-সহ অন্যান্য মুসলমান দল। ভারতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে মুসলমান রাজনৈতিক নেতা ও মুসলমান ধর্মগুরুদের নিদান ছিল জনসংখ্যা বাড়াতে হবে। সেই পরিকল্পনায় তারা সাফলতা পেয়েছে। প্রতি বছর ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধ স্মরণে তারা পরাধীনতা দিবস যাপন করে এবং মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার দাবি জানিয়ে ইংল্যান্ডের রানির কাছে চিঠি পাঠায় নিয়ম করে।

ভোট লুঠেরাদের হাত থেকে রেহাই নেই মহিলাদেরও। (ফাইলচিত্র)।

এই রাজ্যে তোষণকারী কংগ্রেস ও বামেদের মদতে সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ধর্মীয়

প্রচার-প্রসার করেছে মুসলমান নেতারা। গত দশ বছরে এই প্রচার বহু গুণ বেড়েছে। খুব দ্রুত জনসংখ্যার তারতম্য ঘটছে দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর-সহ বিভিন্ন জেলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য মুসলমান তোষণের কারণে সরকারি টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠছে খারিজি মাদ্রাসা ও মসজিদ। রাজ্যের গোয়েন্দা রিপোর্টেই এগুলিকে জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের আতুড়ঘর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারত বিরোধী মুসলমান নেতাদের কাছে লক্ষণীয় টার্গেট হলো বিহারের পূর্বদিকের ছয়টি জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, গুয়াহাটি-সহ নিম্ন অসমের পাঁচটি জেলাকে এবং বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে 'ইসলামিক বাংলাদেশ' গঠনের। যেখানে ইসলামিক অনুশাসন চলবে। যেমন চলে পাকিস্তান, আরব, ইরান, সুদান বা তুরস্কতে।

এভাবেই ভোট বাক্স লুঠ করে প্রকাশ্যে জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা এখন স্বাভাবিক। (ফাইলচিত্র)।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের স্বার্থের কথা ভেবে মুসলমান তোষণ করে চলেছেন। এই বিষয়টি সবাই বোঝেন। কিন্তু এর পাশাপাশি তথাকথিত অতিবাম অথবা ঘোষিত সেকুলারেরা যারা 'আধুনিক মনোভাবাপন্ন' তারাও পরোক্ষে আবার কখনও সরাসরি তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে ইসলামিক আগ্রাসনকে মদত দিয়ে চলেছে। তারা মুখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কিন্তু কাজে তোষণের অন্যতম মদতদাতা। এই সেকুলারদের অনেকেরই ঘরে ভাত নেই কিন্তু বিপ্লব করতে প্রকাশ্যে গোমাংস খেতে পারে। এতে উৎসাহিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এখনই সাবধান না হলে তৃণমূল নেত্রীর এই তোষণের ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী মনে করেন, এভাবে চললে আগামী সিকি শতকের ভেতর রাজ্যের জনগোষ্ঠীর ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। অনেকদিন থেকেই কলকাতার খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, রাজাবাজার, তিলজলা, মহেশতলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের বসবাসকারী হিন্দুরা ভয়ে জায়গা জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রশাসনের কাছে গেলেও বিপদ বাড়ছে। এইসব এলাকায় হঠাৎ করেই ঝা চকচকে বিশাল ভবন তৈরি হয়েছে। যার মালিকানা মুসলমানদের এবং সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। প্রবীণ সাংবাদিকদের বক্তব্য, কেউ চিরকাল ক্ষমতায় থাকেন না। এক সময় যেতেই হয়। কিন্তু কাজ অমলিন থাকে। রাজ্যের মানুষ প্রফুল্ল ঘোষ, অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায়, এমনকী বিধান রায় বা জ্যোতি বসুকেও নিত্যদিন মনে করেন না। তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিস্মৃতির অতলে চলে যাবেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতার লোভে মুসলমান তোষণের ফলে এই বাঙ্গলার মানুষকে ফের উদ্বাস্তু হতে না হয় সেকথা রাজ্যবাসীকে ভাবতে হবে। ক্ষমতার পরিবর্তন না হলে তোষণ বন্ধ হবে না। আর তোষণ বন্ধ না হলে মমতার হাত ধরে হবে দেশের মহা সর্বনাশ।

দিদি বলেছেন, যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খেতে হবে। তাই প্রকাশ্যে সেই গরুরই লাথি খাচ্ছে পুলিশ। (ফাইলচিত্র)

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ এবং সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান

গত ১১ এপ্রিল কলকাতার কেশব ভবনে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা এবং সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা সংস্কার ভারতীর যৌথ উদ্যোগে নববর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হলো। এই উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার নববর্ষ (১৪২৮) সংখ্যার প্রকাশ এবং সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী জয়া শীল ঘোষ, বিশেষ অতিথি রূপে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের রাজ্য সংগঠক বিশ্বাস লপলকর এবং প্রধান বক্তারূপে বিশিষ্ট সাংবাদিক, গবেষক ও লেখক সুজিত রায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আকাশবাণী কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক আশিস গিরি। দীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। দীপ প্রজ্বলন মন্ত্র উচ্চারণ করেন সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা শাখার সদস্যারা। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে প্রকাশক ও স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের অন্যতম অছি সারদাপ্রসাদ পাল স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের সহ সভানেত্রী তথা কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর এবারের বিষয় ছিল কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ শিলা স্মারক। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বাংলা প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মালবিকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক নির্মাণের ইতিহাস প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উল্লেখ্য, এবারের দেওয়ালপঞ্জীর তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়েরই করা। বর্তমান সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ভূমিকা তুলে ধরেন বিশ্বাস লপলকর।

স্বস্তিকার নববর্ষ সংখ্যার বিষয় ছিল 'সংকটে বাঙ্গালিয়ানা'। বাঙ্গলার যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠে নতুন দিনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে বলে সভাপতির বক্তব্যে মন্তব্য করেন আশিস গিরি। বাঙ্গালি সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে লোকগীতি ও ঝুমুর গানের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি একটি গান গেয়ে শোনান। সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধান অতিথি জয়া শীলঘোষ। প্রধান বক্তা সুজিত রায় বাঙ্গলার সংবাদ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রবীর ভট্টাচার্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অর্ণব নাগ। ▮

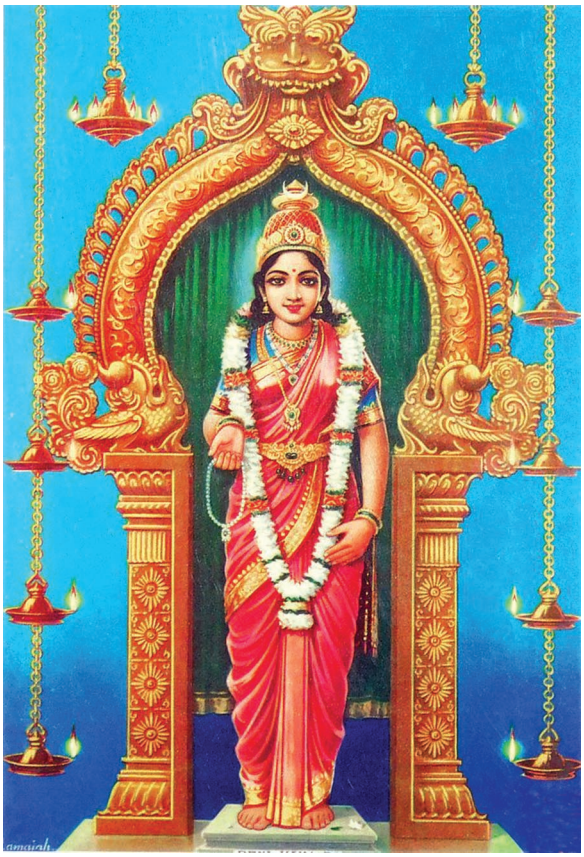

সর্বজনীন জননী দেবী উমা

শেখর সেনগুপ্ত

দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত 'লেক কালীবাড়ি'র বর্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত নিতাই চন্দ্র বসুর নির্দেশ মোতাবেক আমাকে এক সময় হিন্দুধর্মের দেব-দেবীদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা তথা লেখালেখি করতে হয়েছে। আজ অনেকটা সেই সূত্র ধরেই দেবী উমা সম্পর্কে একটি রচনা সম্পন্ন করতে চলেছি আমার প্রিয় পত্রিকা 'স্বস্তিকা'র জন্য।

পুরাণে উমার স্থান উচ্চমার্গে। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর কত কথা মায়ের মুখে শুনেছি। রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, উমা কি আদতে আর্যদেরই দেবী? এই নিয়ে কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সকল পণ্ডিতদের ডিক্লারেশন এক নয়। তাঁদের লিখনে, বচনে, সাহিত্যজাত প্ল্যান-প্রোগ্রামে বিভিন্নতা লক্ষণীয়। যাঁরা উমাকে আর্যদের দেবীরূপে মান্যতা দিতে নারাজ, তাঁদের বিরামহীন যুক্তি, 'উমা' শব্দটাই সংস্কৃত ভাষাজাত নয়। ব্যাকরণ অভিধান হাতড়াতে আপনারা কি বসে যাবেন প্রার্থিত প্রকৃতি প্রত্যয়কে খুঁজে বের করতে? চেষ্টা করেও পাবেন বলে মনে হয় না। আমি চেষ্টা করে বিনিময়ে কিছু পাইনি। ফলে দেবী উমা আর্য না অনার্য, এই প্রশ্নের উত্তরদান আমার সামর্থ্যের বাইরে। পরিচয় আমার একটাই— আমি হিন্দু। ওই এক পরিচয়েই আমার যুগপৎ মান ও অভিমান। আর সেই হিন্দুদের কাছে উমা দেবী রূপেই পূজিতা। ব্যাস। তবে আমার এক বিদ্বান বন্ধু প্রায় দুই দশক আগে হাতে একখানা বই ধরে রেখে এমন একটি প্রমাণ খাড়া করেছিলেন, যা আমাকে মেনে নিতে বাধ্য করে যে, দেবী উমা আর্যকন্যাই। কারণ, পুরাণে বর্ণিত আছে, উমা ছিলেন ধবলবর্ণা, অপরূপা, প্রাসাদে নিবাসিনী। প্রাজ্ঞ বন্ধুর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা স্বীকৃত দলিল হয়ে ওঠে এই ভাবে, 'উমা— এই নামটির প্রথম শব্দ হলো 'উ'। উ শব্দের অর্থ হলো 'শিব'। আর 'মা' শব্দটির অর্থ হলো 'সৌন্দর্য'। অর্থাৎ শিবের যিনি ভূষণ, তিনিই তো উমা। এই শব্দগত তাৎপর্যও জানিয়ে দিল, উমা মানেই তো শিবের ঘরনি।

কালক্রমে শিবের ঘরনি উমা হয়ে গেলেন মা দুর্গা। সর্বজনীন জননী। এক ঝটকায় হননি। এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘ পৌরাণিক পরিক্রমা। মা সদা প্রসন্ন। আবার পাপীদের দমনে, একরকম চ্যাংদোলা করে বিস্মৃতির ঢালে গড়িয়ে দিতে তিনি অতুলনীয়া। তখন স্বামী স্বয়ং শিবও ঘরনিকে নজরে রাখতে দূরদূরান্তে ছুটে বেড়ান। এই প্রসঙ্গে শিব সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণের দরকার। শিব সদা অল্পে তুষ্ট। প্রার্থী ভক্তদের জন্য তাঁর দরদ অসীম। তিনি দিলদরিয়া, কিঞ্চিৎ রসিক ও আমুদে। অবশ্য এই টুকুতেই শিবচরিত্র সীমায়িত নয়। শিব যখন ক্রুদ্ধ হন, পরিস্থিতি যে কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে, পুরাণে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ক্রুদ্ধ মহাদেব যে তাবৎ স্বর্গ-মর্ত্য- পাতালকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারেন তার এর একাধিক নিদর্শন রয়েছে। তাই ধবধবে আলোয় ধ্যানমগ্ন শিব সন্তুষ্ট থাকুন— দেবকুলেরও এটাই প্রার্থনা।

শিবের সেই রুদ্ররূপকে যিনি প্রশমিত করে প্রসন্নতায় ভরিয়ে দিতে পারেন, তিনিই হলেন উমা। প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয়ে গঠনমূলক ভাস্কর্য নির্মাণে তাঁর জুড়ি নেই। উমার প্রতি মহাকবি কালিদাসের আত্মনিবেদনের একটি নমুনা :

উ মোতি মাত্রা তপস্যে নিষিদ্ধা
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগামো।

বিপক্ষকে দমন করতে অথবা তার বিবেককে জাগ্রত করতে উমার শক্তি অসীম। আবার সেই উমার জীবনে দুঃখ-বিষণ্ণতার বহরও আমাদের বেশ বিচলিত করে। তিনি মেনকার কন্যা। শিশুমনে জননীর প্রার্থিত সহায়তা ও মমত্ব তিনি চাননি। 'উমা' শব্দের একটি ব্যাখ্যা আমি ইতিমধ্যে দিলেও ইতিহাসবিদদের উৎপত্তিগত বিশ্লেষণ ভিন্নতর। তাঁরা বলছেন, 'উমা' শব্দটি এসেছে 'ওম্ম' শব্দ থেকে। অর্থ 'সকলের জননী'। তিনি সর্বশক্তিসমন্বিতা, সর্বাত্মিকা, সর্বব্যাপিণী

বহু বহু পূর্বে দ্রাবিড়রা মহেঞ্জদড়ো ও হরপ্পায় এক সমুন্নত

নাগরিক সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। পাথর, ইট, মাটি, চ্যালাকাঠ ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে যে পরিশীলিত জীবনযাত্রায় তাঁরা নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলেন, তার উপযোগিতা ছিল অনস্বীকার্য। নগরের এক প্রান্তে নির্মিত ছিল পাকা ইটের তৈরি মন্দির, —যেখানে দ্রাবিড়রা সমবেত হতেন ঐশ্বরিক শক্তির সন্ধানে। পুরাতত্ত্ববিদরা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে খনন করতে করতে সেই মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন এবং সবিস্ময়ে জ্ঞাত হলেন যে, দ্রাবিড়রা ওই মন্দিরে শিবের পূজা করতেন। অর্থাৎ শিব ছিলেন অনার্যদের দেবতা এবং আর্যকন্যা উমা তাঁরই গলায় মালা পরান। আর্য-অনার্য দুই সভ্যতার লেনদেন প্রক্রিয়ার সুবাদে শিব ও পার্বতী পরবর্তীকালে সবার পূজ্য হয়ে ওঠে। উমাকে নিয়ে কেউ প্রশ্ন শুধোলে তার উত্তরও হবে বহু প্রকারের। যিনি উমা, তিনিই দুর্গা; তিনিই পার্বতী, তিনিই কালী; তিনিই ভবানী। দুনিয়ার আর কোনও ধর্মে— কী ইসলামে, কী ইহুদিদের ধর্মে, কী বিলেতি খ্রিস্টধর্মে— কোথাও কোনও দেবী তথা নারীশক্তির এরকম সম্মান বা স্বীকৃতি নেই। হিন্দুধর্মেই রয়েছে এর প্রকৃত স্বীকৃতি ও ব্যাপকতা। ঘটনা ও বৃত্তান্তের খাঁজে খাঁজে মাতৃশক্তির এমন প্রতিষ্ঠা অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষকদের মূর্ছার কারণ হয়ে উঠতে পারে বই কী! পুরুষপ্রাধান্যের ছড়াছড়ি যেখানে, দেবী শক্তির কথা বলতে গেলে সেখানে বুক ধকধক করবেই।

বিপরীতে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় ব্রতী হলে উমাকে নিয়েই রচিত হতে পারে একাধিক মহাগ্রন্থ। মাতৃচরণে আমাদের প্রণাম চিরকালের। উমা কেবল জগজ্জননী নন, তিনি 'অর্ধনারীশ্বর'ও। একটি বাউল গীতিতেও আমি তাঁর হদিশ পেয়েছিলাম। এমন একটি মূর্তির বর্ণনাও পেয়েছি,— যেখানে এই দেবীর দক্ষিণাংশ পুরুষের অর্থাৎ শিবের। আর বামঅংশ হলো নারীর অর্থাৎ উমা বা পার্বতীর। নিজেদের ভ্রমাত্মক কর্মের দাদন মেটাতে উমার শ্রীচরণে পতিত হন সকল নিষ্ঠাবান হিন্দু। অনার্য ভারতীয়দের মধ্যেও এই ভক্তির কোনও কমতি ছিল না। অতীতে উমাই ছিলেন অবলুপ্ত উপজাতি কাত্যদের মহাদেবী। অপর একটি প্রাচীন উপজাতি কৌশক নর-নারীরা উমার পূজা করত ধূমধামের সঙ্গে। তাদের বিশ্বাস ছিল, উমার কৃপায় তারা তাদের জীবনে কোনও দিন বুড়িয়ে যাবে না। এই কারণেই উমার অপর একটি নাম 'কৌশিনী'।

ব্যক্তিগত জীবনে আমি ভ্রমণলিপ্সু। কয়েকবার হাজির হয়েছি ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু কন্যাকুমারীতে। তখনকার কিছু স্মৃতি মনের মণিকোঠায় আজও জ্বলজ্বলে। একবার কুমারীমাতার মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে বাধা পেলাম। মন্দিরের পুরোহিত হাতে কিছু নিমপাতা নিয়ে প্রায় তেড়ে এলেন, 'ওসব সাহেবি পোশাক পরে এ মন্দিরে ঢোকা যায় না। ভেতরে ঢুকে মাকে প্রণাম করতে হলে শুধু একখানা ধুতি পরে যেতে হবে।'

আমি নিষেধ মেনেছি। মায়ের চরণে উজাড় করে দিয়েছি আপন ভক্তি-শ্রদ্ধাকে। পরে সেই পুরোহিতই আমাকে জানান, মাতা কুমারী হলেন দেবী উমারই এক বিশেষ রূপ। এখানে দেবীর এজলাসে রমণীদেরই প্রাধান্য।

বর্ধমান শহরের 'উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার'-এ বসে আমি পাঠ করেছিলাম এক গ্রিক বণিকের লেখা বহু প্রাচীন গ্রন্থ 'পেরিপ্লাস মেরিন ইন্ডিয়া'। সেখানে মুদ্রিত একটি ছোটো অংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

'...এটাই এই উপমহাদেশের দক্ষিণের অন্তিমপর্ব। কন্যাকুমারী। এখানে সাড়ম্বরে পূজিতা হন দেবী কুমারী। মন্দিরে হিন্দু ভারতীয় রমণীদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। পুরুষরা হাত পেতে প্রসাদ পেলেই খুশি। মন্দিরে পুরুষকে ঢুকতে হলে মহিলাদের অনুমতি নিতে হয় এবং তার পরনে থাকবে একখণ্ড কাপড় মাত্র।...'

কুমারীমাতা দেবী উমারই এক রূপ। অন্য এক স্থানে তাঁর পরিচিতি 'অম্বিকা' নামে। 'অম্বিকা' শব্দের অর্থ 'শুধু মা।' তিনি রয়েছেন কেবল তাঁর সন্তানদের রক্ষার্থে। পুরাণ বলছে, উমা হলেন হিমালয়ের কন্যা। দেবী হাসিখুশি। প্রায়শ জ্যোতির্লিঙ্গের আলোকে উদ্ভাসিতা। শিবকে স্বামীরূপে লাভ করতে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে ভক্তদের মুখে সর্বক্ষণ 'উমা উমা' ডাক।

উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিষ্ঠের কালে
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে।

শিবের প্রতি উমার দুর্মর সীমাহীন প্রেম। রমণী ও পুরুষের প্রেমমাদকতার মূর্ত রূপ উমা ও শিবের বিবাহ। বীণাহস্তে উমা তাঁর নাম বদলে হয়ে গেলেন 'পার্বতী'। পুরাণের বিশেষ পর্বে বর্ণিত হয়েছে সেই কাহিনি।

কিন্তু সুধী পাঠক, আপনি যদি বিন্ধ্যাঞ্চল ভ্রমণে যান, সেখানে পেয়ে যাবেন উমা সম্পর্কে কিছু ভিন্ন বিবরণ। সেখানে তিনি হিমালয়ের ইতিউতি ঘুরে বেড়াতেন না। তিনি চক্কর কাটতেন বিন্ধ্যপর্বতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই কারণে তাঁর একটি নাম বিন্ধ্যবাসিনী। ধ্যানরত শিবের সাক্ষাৎ তিনি ওই পর্বতেই লাভ করেন। উভয়ের পরিণয়ও সম্পন্ন হয়। তন্ত্রের সাধনায় যাঁরা মগ্ন, তাঁরা কাহিনির জট খুলতে খুলতে প্রকৃত শক্তির সন্ধান পান। সেখানে দেবীর রূপ দ্বিবিধ— একদিকে তিনি কল্যাণী, সন্তানদের প্রহরায় রত। অন্যদিকে তিনি ভয়ংকরী— শান্তির স্বার্থে অশান্তির সকল উৎসকে ধ্বংস করবেনই।

বৈদিক যুগে দেবীর মহিমা নানারূপে ব্যক্ত হতে থাকে। ভারতের এক এক প্রান্তে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতিতে উদ্ভাসিতা। মহাকাব্যিক কালে তাঁর মহিমা ব্যাপ্ত হয় রাজনীতিতেও। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দেবীর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। একমাত্র মা দুর্গাই সক্ষম ছিলেন তাঁকে অজেয় করে তুলতে। অর্জুনের সেই সর্বগামী দীর্ঘ প্রতিবেদনসূত্রে আমরা দেবী উমার যে সকল নাম ও কার্যধারার সন্ধান পেয়ে থাকি, তাঁরা হলেন :

উমা, জয়া-বিজয়া, সিদ্ধযোগিনী, ভদ্রকালী, দুর্গা, কুমারী, অর্পণা, চণ্ডী, কালী, কপালী, বিন্ধ্যবাসিনী, কপিলা, কৌশিনী, শাকম্ভরী, জয়া, তারিণী, কাত্যায়নী, মহিলা, জম্বানী, স্বাহা, বেদমাতা, বেদশ্রুতি, শ্বেতা, হিরণ্যাক্ষী, বিরুপাক্ষী, ধূম্রাক্ষী, মায়া, করালী, মহিষরক্তপ্রিয়া, মেরুকন্যা, হ্রী, শ্রী, সাবিত্রী, ধৃতি, দীপ্তি ইত্যাদি। ◻

বামন বিষ্ণু প্রতিমার পুনরুদ্ধার

বিপ্লব বরাট

গত ৫ এপ্রিল, ২০২১ একটি দেবমূর্তি খুঁজে পেলাম। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের সোনাতপল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তপোবন ঘাটে দ্বারকেশ্বর নদের বালির খাদান থেকে বালি তোলার সময় প্রাচীন ক্লোরাইট পাথরের এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি উঠে আসে। শাস্ত্রমতে মোট চব্বিশ প্রকার বিষ্ণুদেবতার প্রতীক চিহ্নের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা অনুসারে চব্বিশটি নাম আছে। এই বিষ্ণুমূর্তির যে 'ফরম' দেখা যায় তা হলো ডান হাতের নিম্নে মাতুলুঙ্গ, ডান হাতের ঊর্ধ্বে চক্র, বাম ঊর্ধ্বে শঙ্খ ও পদ্ম চিহ্ন হতে 'বামন বিষ্ণু' বলা চলে। তাল-মান অনুসারে এটি চারি-তাল মানের। এই কারণে এটিকে বামন শ্রেণীতে ফেলা যাবে।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের বিন্যাস অনুসারে যে চতুর্বিংশতি ব্যূহমূর্তির নামকরণ করা হয় এটি সেই তালিকা অনুসারে হৃষীকেশ মূর্তির লক্ষণযুক্ত বলে মনে হলেও এটি 'বামন বিষ্ণু'। মূর্তিটির উচ্চতা চার ফুট চার ইঞ্চি, চওড়া দুই ফুট তিন ইঞ্চি। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের পাদপীঠে সমপদ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, বনমালা পরিহিত। পৈতে ও মাথায় কিরীট মুকুট রয়েছে। কর্ণপাশা ইত্যাদি সবগুলিই শাস্ত্রসম্মত গঠনরীতি অনুযায়ী খুব নিখুঁত ও পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বামন বিষ্ণুর গদার বদলে মাতুলুঙ্গ আছে। চার জন আয়ুধপুরুষ পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এর পরবর্তী পর্যায় হলো— ত্রিবিক্রম বিষ্ণু। বিষ্ণুর বামনাবতারে অসুররাজা বলির কাছে ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষা চাইলেন। বলি ভিক্ষা দিলেন। তখন বামনরূপী বিষ্ণু এক পদে আকাশ ও একপদে পৃথিবীতে পা রাখলেন। আর এক পা বলির মাথায় রাখিলেন এবং পা দিয়ে ঠেলে বলিকে পাতালে পাঠালেন। এই গল্প অনেক পুরাণেই আছে। বিষ্ণু (অর্থাৎ সূর্য) তিন পা নিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করেন। সন্ধ্যা হতে সকাল এক পা, সকাল হতে দুপুর এক পা, দুপর হতে সন্ধ্যা আর এক পা ফেলেন। জয়পুর ব্লকে বাঁকুড়ার বৃহত্তম ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথরের নির্মিত গোকুলচাঁদ মন্দিরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের কার্নিসের নীচে এক কুলুঙ্গিতে অনুরূপ মূর্তি দেখা যায়। ২০১৭ সালে ২৪ মার্চে জয়পুরে হেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁশি গ্রামে দ্বারকেশ্বর নদে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ও দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার হয়। মূর্তিদুটি আদি-মধ্যযুগ বা পালপর্বের প্রথম দিকের সন্দেহ নেই। দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এক্তেশ্বরে দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তিটি লৌকিক দেবী মনসা ও খাঁদারানি নামে পূজা পাচ্ছেন। এই দ্বারকেশ্বর নদের তীর সংলগ্ন অঞ্চল থেকে প্রাচীন প্রত্ন প্রস্তারাযুধের সন্ধান মিলেছে। দ্বারকেশ্বর বাহিত হয়ে রূপনারায়ণ নামেই আন্তর্জাতিক তাম্রলিপ্ত বন্দর গড়ে উঠেছিল। ঐতরেয় আরণ্যকের কালে এই তাম্রলিপ্ত বিষ্ণুগৃহ নামে পরিচিত। সূর্যের অনেক নাম। অর্যমা দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ প্রত্যুষের সূর্য। অল্পতেজ সূর্যের নাম পুষা। মধ্যাহ্নের সূর্যের নাম বিষ্ণু।

ঋগ্বেদের সূর্য রূপান্তরে বৈদিক বিষ্ণু কল্পিত হয়েছে। সোনাতপল সূর্য মন্দিরের সামনের ঢিবিগুলি শালিবাহন রাজার কীর্তি নামে পরিচিত। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা এবং তাম্রাশ্মীয় যুগে কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে রাঢ় বঙ্গের দ্বারকেশ্বর নদের অবদানও অপরিসীম। অন্ধগ্রাম আজকের ওন্দা। পাশে কোনো সমৃদ্ধশালী প্রাচীন নগর ছিল আজ সেই রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। যা আজকের গড় কোটালপুর নামে পরিচিত। দ্বারকেশ্বর নদের বাম দিকের তটে এক্তেশ্বরের শিব মন্দির ও সোনাতোপলের দেউলটি অবস্থিত ছিল। বন্যার ফলে নদের গতি পরিবর্তনের একটি নতুন খাতে বয়ে চলেছে। যার ফলে প্রাচীন জনপদ ও আমাদের পূর্বপুরুষদের বসতি চলে যায় জলের তলায়। বর্তমানে এক্তেশ্বরের ডানদিকে দ্বারকেশ্বর নদ ও সোনাতপলের বাম দিকে প্রবাহিত। এক্তেশ্বর মন্দির সমীক্ষায় (জে এল নং ২০২, দাগ নং ১১৮) দেখেছি বর্তমানে একটি আধুনিক সূর্য মূর্তি স্থাপন হয়েছে মন্দিরের পেছনে পূর্বকোণে, এই বরাবর দুই কিলোমিটার নদের উপর দিয়ে গেলে সূর্য মন্দিরে আসা যাবে। ইটের তৈরি আনুমানিক ৪৮ ফুট উঁচু ভগ্ন-শিখর বিশিষ্ট সোনাতপল গ্রামের দেউলটি খুব জীর্ণ। দেউলটিকে সূর্য উপাসনার প্রাচীনকেন্দ্র হিসেবে শনাক্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। এটি বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি বলে পরিচিত। এক্তেশ্বর মৌজার সংলগ্ন পূর্বদিকের মৌজা ভীমপুর, রত্নেশ্বর, হরিহরপুর। আবার গন্ধেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর নদের সঙ্গমস্থল বর্তমানে তপোবন গ্রাম, আগে এই দুই নদের মোহনার মিলনের স্থল ছিল দোনামনাতে। কিছু দূরে দ্বারকেশ্বর নদের বাঁকের জন্য স্থানের নাম বাঁকি। তপোভূমি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের বাসভূমিতে তপবন, রামসাগর, অযোধ্যা দ্বারকেশ্বর নদের তীরে গ্রামগুলিতে বিষ্ণুর উপাসকগণ 'ভাগবত' সম্প্রদায় বর্তমানকালে প্রায় বিলুপ্ত হলেও জনজীবনে রামায়ণের ও ধর্মঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়।

সদ্যপ্রাপ্ত প্রত্নমূর্তিটি ওন্দা থানাতে আছে। বিষ্ণুমূর্তিটি সংরক্ষণের জন্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের কিউরেটার তুষার সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

(লেখক বাঁকুড়ার ইতিহাস লেখক ও ক্ষেত্র সমীক্ষক)

SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063, Tel. : 011-25251588, 25253681
Email : suryainterview@gmail.com Website : www.suryafoundation.org

सूर्या फाउण्डेशन युवाओं के समग्र विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अब एक जानी-मानी संस्था बन चुकी है। इसका प्रमुख उद्देश्य है देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अनेक तरह के उत्तरदायित्व निभाने के लिए तेजस्वी, लगनशील तथा धुन के पक्के नवयुवकों का निर्माण करना।

इन्टरव्यू में चयन हो जाने के बाद सूर्या साधना स्थली कैंपस में छः माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एक साल के लिए On Job Training (OJT) रहेगी।

संघ के संस्कारों में पले-बढ़े, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से सक्षम युवकों के सूर्या फाउण्डेशन में प्रवेश हेतु निम्न categories में इंटरव्यू होगा–

Post	Experience	6 months Initial Training + 1 year OJT	After Training CTC
CA	IPCC / MTER (2 Yrs Experience)	3 - 4 L Per Annum	As per Performance
	Fresher	4 - 5 L Per Annum	- do -
	Experienced (upto 5 years)	6 - 8 L Per Annum	- do -
	Experienced (above 5 years)	9 - 12 L Per Annum	-do -
Engineers, Fresher & Experienced	B.Tech (IIT)	7.5 - 9 L Per Annum	- do -
	B.Tech (NIT)	4.5 - 5 L Per Annum	- do -
	B.Tech (Other Institutes)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	M.Tech (IIT)	8.5 - 10 L Per Annum	- do -
	M.Tech (NIT)	5.5 - 7 L Per Annum	- do -
	M.Tech (Other Institutes)	3 - 3.6 L Per Annum	- do -
MBA	MBA (IIT + IIM)	15 L + Per Annum	- do -
	MBA (IIM)	12 - 15 L Per Annum	- do -
	MBA (Other Institutes)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
Post Graduate & Graduate	MCA, B.Ed., M.Ed., MSW, M.Sc., M.Com., M.A. *(Freshers / Experience) Ph.D. **	2 - 3 L Per Annum	- do -
	Mass Communication (Media)	2.4 - 3 L Per Annum	- do -
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	2.4 L Per Annum	- do -
	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Persuing / Passed)	1.2 L Per Annum	- do -
	Diploma	1.8 L Per Annum	- do -
Law	LLB	2 L - 3 L Per Annum	- do -
	LLM	3 L - 3.6 L Per Annum	- do -

- उपरोक्त Categories में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को इससे भी अधिक वेतन दे सकते हैं।

* **Ph.D. candidates भी आवेदन कर सकते हैं। salary interview के दौरान तय होगी।**

2. **Graduate Management Trainee (GMT)**

योग्यता–2020 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 60% तथा गणित में 75% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। OJT / PCT के साथ-साथ ग्रेजुएशन और MBA या MCA करने की सुविधा दी जायेगी। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी, साथ ही 3000/- प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलेगा। On Job Training के दौरान आवास तथा पढ़ाई के साथ-साथ 11वीं में 6000/-, 12वीं में 7000/- Graduation Ist year में 9000/-, IInd Year में 10500/-, IIIrd Year में 12000/-, MBA/MCA Ist Year में 15000/-, MBA/MCA IInd Year में 20000/- Stipend प्रतिमाह मिलेगा। MBA/MCA पूरा होने के बाद 30000/- और Work Performance के आधार पर प्रतिमाह वेतन इससे अधिक भी हो सकता है।

3. **Assistant Staff Cadre (ASC)**

योग्यता– 2020 में 10वीं, 11वीं या 12वीं की परीक्षा देने वाले भैया आवेदन कर सकते हैं। पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 55% एवं गणित में 60% अंक प्राप्त किए हों। आयु : 18 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद OJT / PCT में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 3000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा तथा मुफ्त भोजन और रहने की व्यवस्था होगी। तीन वर्ष की OJT / PCT के दौरान Stipend - Ist year : 7,000/- प्रतिमाह व आवास, IInd year : 8,500/- प्रतिमाह व आवास, IIIrd year : 10,000/- प्रतिमाह व आवास। After training 13,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

4. **Under Graduate Management Trainee (UGMT)**

योग्यता–2020 में 12वीं कर चुके भैया आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में न्यूनतम अंक 70% प्राप्त किए हों और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आयु : 19 वर्ष से कम। सूर्या ट्रेनिंग सेंटर में 6 माह की प्रारंभिक ट्रेनिंग के बाद On Job Training (OJT) or Practical Campus Training (PCT) में भेजा जायेगा। प्रारंभिक 6 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान भोजन और आवास की सुविधा मुफ्त रहेगी। OJT / PCT के साथ-साथ Graduation के बाद MBA/PG in Mass Communication करने की सुविधा दी जायेगी। इस दौरान आवास तथा पढ़ाई के अलावा Graduation IInd year में 12,000/-, IIIrd Year में 14,000/- तथा Post Graduation Ist Year में 17,000/- तथा IInd Year में 20,000/- प्रतिमाह Stipend मिलेगा। Post Graduation पूरा करने के बाद 30,000/- (CTC) प्रतिमाह वेतन मिलेगा।

आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें। विस्तृत बॉयोडाटा के साथ-साथ यदि आपने NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC आदि कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें। सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद अथवा विविध क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे। सूर्या परिवार में कोई परिचित हों तो उनका नाम, विभाग भी जरूर लिखें। पढ़ाई का विवरण लिखते हुए, Mark sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें।

कृपया विस्तारपूर्वक बायोडाटा के साथ निम्नलिखित पते पर अपना CV / आवेदन भेजें। CV / आवेदन Email से भी भेज सकते हैं।

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063 | Email : suryainterview@gmail.com

आवेदन विज्ञापन छपने के एक माह के भीतर करें

বাম, মমতা, কংগ্রেস ও আব্বাসদের মোদী বিরোধিতা বাংলাদেশের জেহাদিদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা

একলব্য রায়

২০১৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। সে সময় ওই সফরকে ঘিরে কোনোরকম বিক্ষোভ আন্দোলন হয়নি। কিন্তু গত ২৬ মার্চ, ২০২১ বাংলাদেশের ৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বাংলাদেশ সফরকে ঘিরে বিক্ষোভ আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য খালি হাতে যাননি। বাংলাদেশকে ভারতের উপহার হিসেবে তুলে দিয়েছেন ১২ লক্ষ কোভিড টিকা। কিন্তু বিক্ষোভ আন্দোলনে এর কোনো প্রভাব নেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফর ঘিরে বিক্ষোভ আন্দোলনে পরিস্থিতি রক্তাক্ত। বিভিন্ন সংগঠন ও হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভে চট্টগ্রাম ও ঢাকা উত্তপ্ত। একাধিক বিক্ষোভকারী পুলিশের গুলিতে নিহত। বিক্ষোভ ছড়িয়েছে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায়। তবে চট্টগ্রামের পরিস্থিতি চিন্তাজনক হয়ে উঠেছিল। এখানে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে চার বিক্ষোভকারীর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'মুসলমান বিরোধী' এই অভিযোগে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংগঠন হেফাজতে ইসলাম নরেন্দ্র মোদীর সফরের বিরোধিতা করে ঢাকা-সহ দেশের সর্বত্র বিক্ষোভের ডাক দেয়। হেফাজতের ঘাঁটি চট্টগ্রামে দিনভর ছিল উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয় দফায় দফায়। বিক্ষোভ সামাল দিতে পুলিশ গুলি চালায়। এতে চার জনের মৃত্যুর সংবাদ এসেছে। জখম অনেকে। মৃত প্রত্যেকেই সংগঠনের সমর্থক এমনই দাবি হেফাজতে ইসলামের। উগ্র ধর্মীয় এই সংগঠন আগেও হিংসাত্মক আন্দোলন ছড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্ত। গুলি চালানোর প্রতিবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে থেকেই রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মোদী বিরোধী মিছিলও করে।

বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবেন মোদী। আবার মোদীর সামনে বিরোধী দলগুলো যেন হালে পানি পাচ্ছে না। সেজন্যই দেশের ভিতরে-বাইরে ভারত বিরোধী অস্থিরতা তৈরির প্রয়াস, মোদী বিরোধিতায় এরা এক সূত্রে বাঁধা।

বাংলাদেশের উগ্র জেহাদি গোষ্ঠীর সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস নেতারা নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা শুরু করেন। তবে এক্ষেত্রে অভিযোগের ধরন একটু অন্যরকম। পশ্চিমবঙ্গের এই দলগুলির অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্যই নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ গিয়ে মতুয়া মহাতীর্থে গিয়েছেন, যশোরেশ্বীর কালীমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জি তো নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর হুমকি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পাসপোর্ট, ভিসা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মর্মে ২ এপ্রিল শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছে সংযুক্ত মোর্চা। সিপিএম নেতা রবীন দেব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ভোটের দিন সভা করছেন। বাংলাদেশে শান্তনু ঠাকুরকে নিয়ে যাচ্ছেন। ভোটারদের প্রভাবিত করছেন তিনি।'

১ এপ্রিল ২০১১, জয়নগর ও উলুবেড়িয়ায় সভা করেন মোদী। সংযুক্ত মোর্চার বক্তব্য, ওই দুটি সভায় ধর্মীয় প্ররোচনা দেওয়ার কাজ করেছেন মোদী। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে তারা। এই সভাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'জয় শ্রীরামে আপত্তি দিদির। দুর্গাপুজোর বিসর্জনেও আপত্তি ওঁর। তিলক, গেরুয়া পোশাকও পছন্দ করেন না। দিদির লোকেরা টিকি থাকা মানুষদের রাক্ষস বলছেন। আমাকে গালি দিন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আস্থা, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও চৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্কারকে গালি দিতে দেব না।' বাংলাদেশ সফরের উল্লেখ করে মোদী মন্তব্য করেন, 'একান্ন শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম যশোরেশ্বরী মায়ের পুজো করেছি। এতেও দিদির সমস্যা। ওড়াকান্দিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের পুণ্যভূমিতে গিয়ে আশীর্বাদ চেয়েছি। ক্ষুব্ধ হয়েছেন উনি। মা কালীর মন্দিরে যাওয়া ভুল নাকি? হরিচাঁদ ঠাকুরের পুজো করা ভুল? দিদি, আমি মরসুমি পুণ্যার্থী নই। নিজেদের আস্থায় গর্বিত আমরা।'

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে এই বিক্ষোভ কেন? ভারতের টিকা নিতে আপত্তি নেই, ভারত খাবার পাঠালে নিতে আপত্তি নেই, ছিটমহল বিনিময়ের সময় বাড়তি দশ হাজার একর জমি দিয়েছে সেটা নিতে আপত্তি নেই, ভারতের চিকিৎসায় আপত্তি নেই, পেঁয়াজ নিতে আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু

ফঃ ৫

ভারতের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। তাও ২০১৫ সালে ভালো মানুষ মোদী, ২০২১ সালে এতটা খারাপ হয়ে গেলেন কেমন করে? ভারতেও সিএএ বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন, দীর্ঘমেয়াদি শাহিনবাগ আন্দোলন, সাম্প্রতিককালের কৃষক আন্দোলনের লক্ষ্যও কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে সরানো। ভারতে ও বাংলাদেশে এই আন্দোলনগুলির স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য কিন্তু একই। এখানেই শেষ নয়, নরেন্দ্র মোদী বিদেশের মাটিতে পা রাখলেই ছোটোখাটো বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। বিদেশ ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন সুইডেনের ভি-ডেম, আমেরিকার ফ্রিডম হাউস তাদের মতো করে রিপোর্ট প্রকাশ করে প্রচার চালাচ্ছে ভারতে নাকি স্বৈরতন্ত্র চলছে, গণতন্ত্র নেই। এর থেকে স্পষ্ট শুধু ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদী নয়, জাতীয়তাবাদী ভাবনা সম্পন্ন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্থির করে তোলার জন্য, দুর্বল করার জন্য দেশের ভেতরে-বাইরে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

এই সমস্ত বিরোধিতার কারণ বিশ্লেষণ করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তা হলো স্বাধীনতার পর থেকে ভারতকে নিয়ে বিগত বাহাত্তর বছর ধরে ইসলামিক, মাওবাদী ও চার্চ— এই তিন গোষ্ঠীর গড়ে তোলা ছক বানচাল করে দিয়েছে বর্তমান মোদী-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। দেশভাগের পর মুসলিম লিগের জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'হাসকে লেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১, ১৯৯৯ সালে ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই 'লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থানে'র স্লোগান পরিবর্তিত হয়ে ভারত দখলের নতুন রণকৌশল তৈরি হয় 'ঘুসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' পাকিস্তানি কিংবা বাংলাদেশি মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশে 'ঘুসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থান'-এর ইসলামিক অ্যাজেন্ডার সাফল্যের পথে কোনো বাধা ছিল না। মুসলিম লিগের সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক দোসর কমিউনিস্ট ও নেহরুপন্থী কংগ্রেসের সচেতন প্রয়াসের ফলে স্বাধীনোত্তর ভারতে মুসলমান- তুষ্টিকরণের যে উর্বর রাজনৈতিক মাটি তৈরি হয়েছে তাতে যেন মমতা, কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব ইত্যাদি বিভিন্ন নামে মুসলিম লিগ নেতা জিন্নারই পুনর্জন্ম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে সেকুলারিজমের আড়ালে মুসলমান তোষণের রসে পুষ্ট এই সমস্ত দল মুসলিম লিগের 'ঘুসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থানের' অ্যাজেন্ডা রূপায়িত করে চলেছে। ফলে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে অসংখ্য মিনি পাকিস্তান তৈরি হয়েছে যেখানে নির্বিচারে পাকিস্তানের পতাকা উড়ে থাকে। কাশ্মীরে সেনা জওয়ান হত্যা, সেনা জওয়ানদের উপর পাথর ছোঁড়ার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে, কেরলে কোনো সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার হলেও তার পক্ষে রাজ্য সরকারের কোনো নেতা-মন্ত্রী দাঁড়িয়ে যায়। ২০১৯-এর শেষের দিকে মুর্শিদাবাদে এনআইএর হাতে ছয়জন আলকায়দা জঙ্গি গ্রেপ্তার হলে মমতা সরকারের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা তাদের নির্দোষ দাবি করে সরাসরি মুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন। কেরলে আলকায়দা জঙ্গি ধরতে গিয়ে এনআইএর সদস্যরা কাশ্মীরের মতো জেহাদি জনতার হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জওহরলাল নেহরুর মতো ক্ষমতালোভী কংগ্রেস নেতার সৌজন্যে পাকিস্তানের দখলে গেছে 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর নামে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য'। ভারতে চীনের রাজনৈতিক ভৃত্য মাওবাদী দলগুলি ও মূলস্রোতের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে চীনের দাদাগিরি এখন সর্বজনবিদিত। সেকুলারিজমের আড়ালে ভারতে ইসলামিক উগ্রপন্থাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই এদেশে সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত। চার্চের মাধ্যমে সেবা কাজের আড়ালে ধর্মান্তরকরণ চালিয়ে ভারতকে খ্রিস্টান প্রধান দেশে পরিণত করার চক্রান্তে লিপ্ত পশ্চিমি শক্তিগুলি। এরজন্য হাজার হাজার এনজিও তৈরি করা হয়েছিল যাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি অর্থ আসতো ধর্মান্তরকরণের জন্য।

২০১৪-সালে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশবাসী জানতে পারে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবিরোধী ক্রিয়াকলাপের আতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। যেখানে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' স্লোগান উঠে, দেশের সংসদে হামলাকারীর জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হয়, পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান উঠে, 'আজাদি'র স্লোগান দিয়ে দেশভাগের ষড়যন্ত্র করা হয়। দেশের প্রধান বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী সরকারকে আক্রমণ করার জন্য পাকিস্তান বা চীনের সুরে কথা বলছে। এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম চীন বা পাকিস্তানের মতো শত্রুদেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজের দেশের সেনাবাহিনীর পরাক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং নিহত জঙ্গির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে চলেছে।

স্বাধীনোত্তর ভারতে এই সমস্ত অ্যাজেন্ডায় সর্বপ্রথম বড়োসড়ো আঘাত হানলো নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। খ্রিস্টান মিশনারিদের অপকর্ম রুখতে বন্ধ করে দেওয়া হলো বিদেশি অর্থে পুষ্ট কয়েক হাজার এনজিও। ৩৭০ ধারা বিলোপ করে দিয়ে কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে পরিণত করে এই সরকার ব্যর্থ করে দিয়েছে কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে উদ্বাস্তু হিন্দুদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করে এদেশের মূলস্রোতের মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে এই সরকার। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে রামমন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় আসার পর মন্দির নির্মাণে হাত দিয়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বড়ো পদক্ষেপ নিয়েছে এই সরকার। তিন তালাক আইন পাশ করে মুসলমান মহিলাদের মৌলবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করা, রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীকরণের প্রয়াস শুরু করে 'সেকুলার ভারত'-এর মুখোশের আড়ালে 'ঘুসকে লেঙ্গে হিন্দুস্থানের' চক্রান্ত বানচালের প্রয়াস করে জেহাদি শক্তিকে বড়োসড়ো আঘাত দিয়েছে। দেশের ভিতরের দেশবিরোধীরা ও তাদের দোসর দেশের বাইরের শত্রুদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, এই সরকার আজ হোক কিংবা কাল ইউনিফর্ম সিভিল কোড, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধকরণের জন্য কিছু কঠোর আইন প্রণয়ন করতে বদ্ধপরিকর। এই সমস্ত আইন পাশ হলে দেশের শত্রুদের বিনা যুদ্ধে ভারত দখলের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেজন্যই দেশের ভিতরে-বাইরে ভারত বিরোধী অস্থিরতা তৈরির প্রয়াস। ▯

বাংলাদেশে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পিছনে বাম এবং মৌলবাদীরা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ যে বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে ভারত রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে নানা বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়িয়েছে, সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর গৌরবজনক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যোগদানের বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভ-তাণ্ডব হয়েছে, হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এটা সত্যিই অকল্পনীয়। এই বিক্ষোভে উগ্র ইসলামি দলগুলো যেমন যোগ দিয়েছে, তেমনি বামেরাও অংশ নিয়েছে। ইসলামি দলগুলোর সামনে ছিল হেফাজতে ইসলাম— কওমী মাদ্রাসাগুলো মূলত যাদের শক্তি। পেছনে ছিল জামায়াতে ইসলামি, যে দলটি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে, কার্যত ঘাতকবাহিনী হিসেবে কাজ করেছে। অন্যান্য ইসলামি দলগুলোও পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ছিল। অন্যদিকে যে বাম দলগুলো বিক্ষোভ দেখিয়েছে তারা রাজনীতিতে চীনপন্থী ও প্রচণ্ড ভারতবিরোধী বলে পরিচিত। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই চীনপন্থী বামেরা চীনের নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও জামায়াত-আল বদর, রাজাকারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে এই দুই রাজনীতির মেলবন্ধন একাত্তরের মতোই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এবার দৃশ্যপটে এক নম্বরে নতুন উগ্রবাদী ইসলামি দল হেফাজত। এই মেলবন্ধনের তাণ্ডবে বাংলাদেশের এক গৌরবময় উদযাপনের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় সংযুক্ত হলো।

তবে গোটা ঘটনাকে শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখলে হবে না। অবস্থা বলে দিচ্ছে এর সঙ্গে এই উপমহাদেশের রাজনীতিও যুক্ত। শুধু একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। বাংলাদেশে হেফাজত-জামায়াত-সহ ইসলামি উগ্রপন্থীরা নরেন্দ্র মোদীকে 'মুসলমান বিদ্বেষী' অভিযোগ করে তাঁর সফরের প্রতিবাদ জানিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। অথচ উইঘুর মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, নামাজ, রোজা রাখতে বাধা দেওয়া এবং নারীদের বন্ধ্যা করে সংখ্যা হ্রাসের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বে তোলপাড় হলেও বাংলাদেশের হেফাজত-জামায়াতিরা কখনো চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি, নিদেনপক্ষে একটা বিবৃতিও পাঠায়নি সংবাদপত্রে। অন্যদিকে হেফাজত ছাড়াও যে-বামেরা মোদীর সমালোচনা করেন, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের বিরোধিতা করেন, তারা কখনো বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা-নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন না। সর্বশেষ ১৭ মার্চ সুনামগঞ্জের হিন্দু গ্রাম শাল্লা হেফাজতের হামলায় তছনছ হয়ে গেল, মহিলারা নির্যাতিত হলেন, বাড়িঘরে লুটপাটের পর আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হলো, তার প্রতিবাদ তারা জানালেন না। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিয়মিত হামলা-নির্যাতন, জায়গাজমি দখল, মঠ- মন্দিরে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের প্রতিবাদ তারা করেন না। হিন্দুদের নিয়মিত দেশত্যাগ নিয়েও তারা কথা বলেন না। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলার পর দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে। প্রায় তিন হাজার মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে গুঁড়িয়ে

দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বাংলাদেশে এই চীনপন্থী বামেরা হিন্দুদের পাশে দাঁড়ানো দূরে থাক, প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। তখন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নজিরবিহীন। বাংলাদেশের সামরিক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ জ্যোতিবাবুর এই বক্তব্য বড়ো করে ছাপতে সংবাদপত্রকে বাধ্য করেছিলেন। ২০০১ সালে বিএমপি-জামায়াত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার বাড়িঘর, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখনো এপারের ওই বামেরা চুপ ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার প্যালেস্টাইনিদের জন্য কান্নাকাটি করে, কিন্তু এপারে মানবতাবিরোধী তাণ্ডবে টু শব্দ করেনি। বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখেছে। এই ইতিহাস না জানলে আজকের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা যাবে না।

অভিন্ন ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভারতের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। এই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালি যেমন প্রাণ দিয়েছে, তেমনি ভারতের কয়েক হাজার সেনাও আত্মদান করেছে। দু'দেশের রক্ত এক ধারায় মিশেছে। ওই নয় মাসে বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষকে ভারত আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দিয়েছে, প্রশিক্ষণ দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়তে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ত্রিশটিরও বেশি দেশ সফর করেছেন। বাড়তি ব্যয় মেটাতে ভারতবাসীকে বহন করতে হয়েছে বাড়তি করের বোঝা। ১৬ ডিসেম্বর পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে বাংলাদেশ-ভারতের যুগ্ম কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে। এভাবেই ঘটেছে নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। স্বাধীনতার পর ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়েছে ভারত, অন্য কোনো দেশ এগিয়ে আসেনি। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা হলে তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান বিদেশে থাকার সুবাদে। ভারতে সসম্মানে তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দুর্দিনে মুক্তিযুদ্ধের ধারা রক্ষায় বারবার এগিয়ে এসেছে ভারত। ইসলামি উগ্রবাদীরা পাকিস্তানের মদতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেছে বারবার। শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা করেছে কয়েকবার। জিয়াউর রহমানের বিএনপি, এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় থাকার সময় পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো বাংলাদেশের মাটিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে। বাংলাদেশের উল্লিখিত সরকারগুলো তাদের সর্বাত্মক সহায়তা করে। প্রথম এরশাদ ও পরে দল বদল করে খালেদার মন্ত্রীসভার সদস্য সম্প্রতি প্রয়াত মওদুদ আহমেদ জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মুক্তিযোদ্ধা আখ্যায়িত করেছিলেন। বিএনপি-জামায়াতের আমলে ২০০৪ সালে অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য ১০ ট্রাক অস্ত্র চালানের কথা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। খালেদা ও জামায়াত নেতারা এই চালানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বিদেশ থেকে এসব অস্ত্র এসেছিল খালেদার মন্ত্রীসভার এক সদস্যের জাহাজে করে। পরে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি নির্মূল করে দেওয়া হয়। কয়েকজন শীর্ষ নেতাকেও ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। শুধু বিএনপি-জামায়াত নয়, পাকিস্তান ও চীনও এতে ক্ষুব্ধ হয়।

সর্বশেষ করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত পাশে দাঁড়িয়েছে সেই একাত্তরের ভূমিকায়। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকার টিকা যা কোভিশিল্ড নামে পরিচিত, পাঠানো নিয়ে চুক্তি হয়েছে। তার বাইরে প্রথম দফায় ২০ লক্ষ ডোজ টিকা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। যে টিকা এসে পৌঁছানোর সঙ্গে বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর আরও ১২ লক্ষ টিকা উপহার হিসেবে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ২৬ মার্চ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীর দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় যোগদানের জন্য পাকিস্তান ছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং নেপাল ও মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানমালা ছিল বাংলাদেশের গৌরবের। এই অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা।

শেষ দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঢাকা আসেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সম্মানিত অতিথি। দিনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসও, একাত্তরের এই দিনের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। এর পর তাঁকে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। এদিনেই বাংলাদেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী ছিল বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পাশে। একই সঙ্গে রক্ত দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির বিরোধিতা করে যারা তাণ্ডব চালিয়েছে তারা আসলে কী বার্তা দিতে চেয়েছে তা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই অনুধাবন করতে হবে।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী ও জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার প্রথম দিন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে (১৭ মার্চ) সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত নোয়াগাঁও গ্রামে হেফাজতে ইসলাম হামলা চালিয়ে প্রায় একুশটি বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ করে। নিগৃহীত হন মহিলারা। হেফাজতের এই হামলায় সঙ্গে ছিল আওয়ামি লিগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীরা। অনুষ্ঠানমালার শেষদিন ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগমনের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজধানী ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চট্টগ্রামে তাণ্ডব চালিয়েছে দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী হেফাজতে ইসলাম। অন্যান্য ইসলামি দলও তাণ্ডবে অংশ নেয়। তিনদিন ধরে চলে এই তাণ্ডব। সরকারি হিসেবে নিহত হয় ১৭ জন। আহত শতাধিক।

হেফাজতে ইসলাম ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ইসলামি শক্তি হিসেবে পরিচিত। ২০১৩ সালে হেফাজত সহিংসভাবে ঢাকা অবরোধ করে আওয়ামি লিগ সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছিল।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অত্যন্ত কড়া হাতে অবস্থা সামাল দিতে হয়। বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। কিন্তু কিছুদিন পরই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, এই সহিংস ঘটনার পর সরকারের সঙ্গে হেফাজতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও হেফাজত রাজনৈতিক দল নয়। গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হেফাজতের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকের খবর ও ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও হেফাজতের ঘোষিত নীতিতে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নারী নেতৃত্ব হারাম। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথ-সহ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের লেখা বাদ দেয় কিংবা কমিয়ে দেয়। উগ্রবাদী কওমী মাদ্রাসার ডিগ্রিকে সাধারণ শিক্ষার সমমানের করা হয়। এর ফলে কওমী ডিগ্রিধারীরা সাধারণ শিক্ষার ডিগ্রিধারীদের সঙ্গে সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এ নিয়ে প্রচণ্ড সমালোচনা হলেও প্রধানমন্ত্রী তাতে কর্ণপাত করেননি। মন্ত্রীসভার তিন সদস্য এর প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের ইস্তফা দিতে বলেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের সামনে গ্রিক দেবীর একটি ভাস্কর্য স্থাপন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃপক্ষ, হেফাজত-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। প্রধানমন্ত্রী তা সমর্থন করেন। ফলে এই ভাস্কর্য তড়িঘড়ি সরিয়ে নিতে হয়। ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সামনেও একটি বাউল ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছিল নগরীর নান্দনিক সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে। সেটিও ভেঙে ফেলতে হয় হেফাজত হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর। জামায়াত যেহেতু বিএনপির সঙ্গে আছে, শেখ হাসিনা তাই সম্ভবত হেফাজতকে পাশে রাখতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক সমীকরণ। কিন্তু উগ্র ইসলামি রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যায় না, এটা সম্ভবত শেখ হাসিনা বুঝতে পারেননি। হেফাজত হাসিনার কাছ থেকে নিয়েছে অনেক, এমনকী তাদের প্রধান কেন্দ্র হাটহাজারী মাদ্রাসার জন্যে বিস্তৃত জমিও। হেফাজত হাসিনাকে শেষ উপহার দিল বাংলাদেশের বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর সফরের রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ জানিয়ে।

উল্লেখ করতেই হয়, কয়েক মাস আগে করোনার মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ভাস্কর্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে হেফাজত অন্যান্য দলকে নিয়ে তুমুল

বিক্ষোভ শুরু করে, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করার হুমকি দেন হেফাজত নেতারা। দেশের কয়েকটি স্থানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ভাঙচুর করা হয়। শেখ হাসিনা হেফাজতের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেননি।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকীর দশদিন ব্যাপী অনষ্ঠানমালায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতির প্রতিবাদে ২৬ মার্চ প্রথমে ঢাকায় বায়তল মোকাররম মসজিদে দুপুরের নামাজের পর সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়। এর কিছ পরেই চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। হাটহাজারীতে থানা ও বিভিন্ন সরকারি ভবন আক্রান্ত হয়। আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে তিনদিন ধরে তাণ্ডব। এই তাণ্ডবে শহরের ২ নম্বর পুলিশ ফাঁড়ি, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, গণপূর্ত ভবন, সড়ক ভবন, মৎস্য ভবন, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, সার্কিট হাউস আক্রান্ত হয়। সার্কিট হাউসে জেলা পরিবহণ পুলের ১০টি গাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে দুই নম্বর পুলিশ ফাঁড়িতে ১০টি মোটরসাইকেল এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ৪টি গাড়ি এবং ১০টি মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে একটি এবং মৎস্য ভবনের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মূল্যবান কিছু নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, সদর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ও আক্রান্ত হয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের বাড়ি যেটা এখন সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র, বার বার হামলার শিকার হয়েছে, গানবাজনা ইসলামে হারাম এই অভিযোগে। ওস্তাদের তানপুরা, তবলা ও বইপত্র আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই। এবারের হামলায় সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে, মুক্তিকামী সর্বস্তরের মানুষের কাছে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। যে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয় নরেন্দ্র মোদীর আমলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা মোদীর আমলে ব্যাপকতা লাভ করে। ভারত ট্রানজিট পায়, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য এক উজ্জ্বল সম্ভবনার দিগন্ত উন্মোচন করে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে যা অর্জন অতীতে তা দেখা যায়নি। ২০১৮ সালে নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বড়ো দেশগুলির ভূমিকা শেখ হাসিনার জন্য অস্বস্তিকর ছিল। মোদী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়ান। মোদীর সময়েই দু'দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এক্ষেত্রে চীনের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। মোদীর একটা ব্যর্থতা ছিল, তিস্তা চুক্তি। গভীর আন্তরিকতা সত্ত্বেও তিনি তা করতে পারেননি। কেন পারেননি তা সবাই জানেন। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের এই মাত্রার দাবিদার স্বাভাবিকভাবেই শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশের ভেতরের ও বাইরের বৈরী শক্তিগুলো এই অবস্থা মেনে নেওয়ার কথা নয়। আর বাংলাদেশের ইতিহাস এক গৌরবজনক অধ্যায়েই মোক্ষম আঘাতটা হানল তারা।

এতে নরেন্দ্র মোদী বা শেখ হাসিনা কিংবা ভারত বা বাংলাদেশ অপমানিত হয়নি। ধর্মীয় উগ্রবাদ ও চীনা বামেদের চেহারা ও উদ্দেশ্য একাত্তরের মতো আবারও প্রকটিত হলো। ভবিষ্যতেই বলে দেবে দু'দেশ কীভাবে এগুবে।

১লা বৈশাখ

ছোট্টবন্ধুরা, ১লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙ্গালিদের জীবনে নতুনভাবে নতুন উৎসাহে যাত্রা শুরু করার দিন। নতুন বছর আমাদের জীবনে বয়ে আনে নববাণী। সেই বাণী জীবন গঠনের। কবিগুরু তাঁর কবিতায় লিখেছেন, ‘ পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি গেছে কেটে। যাক কেটে ওরে যাত্রী।’ আমাদের জীবনের যা কিছু পুরাতন, যা কিছু জীর্ণ, তা যেন দূরীভূত হয়। আমাদের জীবন যেন নতুন করে শুরু হয়।

প্রকৃতির স্বভাবের লক্ষণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদের দেশে বর্ষ গণনা করা হয়। শীতের পরে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যখন নতুন ভাবে সেজে ওঠে তখনই ভারতীয় নববর্ষের সূচনা হয়। চৈত্রমাসের শুক্লাপ্রতিপদ তিথি অর্থাৎ বর্ষপ্রতিপদের দিনটিই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় নববর্ষ। এর কয়েকদিন পরেই বিভিন্ন রাজ্যে নববর্ষ পালিত হয়। বঙ্গবীর রাজা শশাঙ্ক পয়লা বৈশাখ থেকে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেন। সেই থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বাংলা নববর্ষ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিকে আমরা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করি, নব আনন্দে জেগে ওঠে মন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শেষ জীবনে আত্রাই নদীর পথ ধরে পতিসরে এসে থাকার সময়ে বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটিতে প্রজাদের মাথায় শোলার মুকুট পরিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিতেন। বাঙ্গালির

নববর্ষে যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো ব্যবসায়ীরা এই দিনে তাঁদের হালখাতা অনুষ্ঠান করেন। অপরটি হলো তাঁরা গণেশ মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পুজো করেন। এই দুটো অনুষ্ঠান অনেককাল আগে থেকেই পালিত হয়ে আসছে, এখনও হচ্ছে। এদিন ব্যবসায়ীরা বিগত বছরের যাবতীয় হিসাবনিকাশ চুকিয়ে আবার নতুন করে হিসাবনিকাশের পালা শুরু করেন

ব্যবসায়ীদের গণেশ পুজো করার কারণ হলো নববর্ষের সঙ্গে দেবতা গণেশের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এনিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে ও পুরাণে বিভিন্ন উপাখ্যান রয়েছে। গণেশের অনেক নাম— সিদ্ধিদাতা, গণপতি, বিঘ্নেশ্বর, বিনায়ক, গজানন ইত্যাদি। ব্যবসায়ীরা গণেশকে সিদ্ধিদাতা হিসাবে, ব্যবসায়ের অমঙ্গল নাশক হিসাবে বেশি মান্যতা দেন। তারা এদিন ফুল, পল্লব মালা, সিঁদুর দিয়ে দোকান সাজায়। গৃহীরা নিজ নিজ ঘরে আলপনা দেয়, ভক্তিভরে গৃহদেবতার পূজা করেন। ধনী-দরিদ্র সকল মানুষ নতুন জামাকাপড় পরে। সাধ্যমতো সকলেই ভালো খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করে। সবাই মনে করে বছরের প্রথম দিনটা ভালোভাবে কাটলে সারাটা বছর ভালো যাবে। এদিন কোথাও কোথাও সকালে অথবা বিকেলে শোভাযাত্রা হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

বাঙ্গালিদের নববর্ষ নিছকই নতুন বছরের সূচনামাত্র নয়। এর পিছনে রয়েছে নতুন করে মানুষের জীবনে চেতনা জাগিয়ে তোলার এক নবপ্রেরণা। যে প্রেরণা মানুষকে এগিয়ে যাবার পথ দেখায়। তাই এই দিনটির রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। বিশ্বে সমস্ত বাঙ্গালি এদিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের পথে পথে

অমরনাথ

৩৮৮০ মিটার উঁচুতে পবিত্র হিন্দুতীর্থ অমরনাথ গুহা। গুহার শেষ প্রান্তে বরফে তৈরি শিবলিঙ্গ। সারা বছর ধরে পাহাড়ের ফাটল বেয়ে চুঁইয়ে পড়া জলে বরফ জমে রূপ নেয় শিবলিঙ্গের। কখনো কখনো ৮ ফুট উঁচু হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ছড়ি মিছিল হয়। সারা ভারত থেকে আসা হাজার হাজার ভক্ত ছড়ি মিছিলে অংশ নিয়ে অমরনাথ দর্শনে যান। অষ্টম শতকে আদি শঙ্করাচার্য নতুন করে তীর্থযাত্রার প্রবর্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে ১৮৯৮-এ অমরনাথ দর্শনে আসেন। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ অমরনাথ দর্শন করেন।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশ ও তাদের পার্লামেন্ট

- সুইজারল্যান্ড–ফেডারেল অ্যাসেম্বলি
- আর্জেন্টিনা--ন্যাশনাল কংগ্রেস
- ডেনমার্ক – কেকেটিং
- ফ্রান্স– ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি –
- ইন্দোনেশিয়া–পিপলস কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি
- গ্রিস–চেম্বার অব ডেপুটিজ
- নরওয়ে–স্টরটিং
- জাপান – ডায়েট
- বাংলাদেশ–জাতীয় সংসদ
- নেপাল–রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত
- উরুগুয়ে –কংগ্রেস
- উজবেকিস্তান–মজলিস
- ইরান– মজলিস
- ইজরায়েল–নেসেট
- ভুটান–সোংডু

ভালো কথা

মাস্ক বিতরণ

এবার চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাবা এক ব্যাগ মাস্ক কিনে নিয়ে এল। মা বলল এত মাস্ক কী হবে? বাবা বলল খবর তো রাখো না আবার ভয়ংকর রূপে করোনা এসে গেছে। মা বলল তিনজনের জন্য এক ব্যাগ মাস্ক? বাবা আর কিছু বলল না। একটু পরে বাবা আমাকে বলল কাল নববর্ষ। সকালে আমরা তিনজনে বাজারে যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে সবাইকে মাস্ক বিলি করব। মা শুনে তো খুব খুশি। পরদিন সকালে আমরা তিনজন বাজারে গিয়ে যাদের মুখে মাস্ক নেই তাদের হাতে একটা করে দিয়ে অনুরোধ করলাম, নিজে ও পরিবারের সবার প্রাণ বাঁচাতে মাস্ক ব্যবহার করুন। দু'একজন রেগে গেলেও সবাই নিয়েছে। দোকারদারদেরও আমরা দিয়েছি।

মুমন সাহা, অষ্টম শ্রেণী, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

১লা বৈশাখ

প্রিয়ম হালদার, অষ্টম শ্রেণী, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা।

আমাদের নববর্ষ ১লা বৈশাখ
দিকে দিকে বেজে ওঠে মঙ্গল শাঁখ।
বাড়ি বাড়ি পূজা হয়, হয় কত আনন্দ
বাড়িতে ও দোকানে খাওয়াদাওয়া ভালোমন্দ।
আমাদের নববর্ষ পয়লা বৈশাখ
ভগবানে প্রার্থনা সবাই সুখে থাক।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৬।।

ফল প্রকাশিত হলো।

প্রত্যেক শনিবার মাধবরাও ধর্মতত্ত্ব, জীবনের লক্ষ্য এবং রাষ্ট্রের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য প্রয়াগের এক বন্ধুর কাছে যেত।

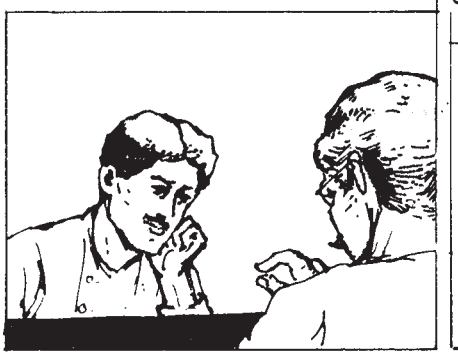

তখন ভগৎ সিংহ, সুখদেব এবং রাজগুরুর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড খবরের শিরোনামে। মাধবরাও তার বন্ধুকে চিঠি লিখল।

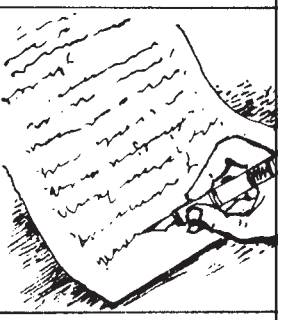

...এটা অত্যন্ত আনন্দের যে লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে ইংরেজদের দুর্ব্যবহারের প্রতীকী প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে।

মাধবরাও নাবিকদের জীবন সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য মাদ্রাজ গেল। সেখানে একটি মাছের অ্যাকুরিয়াম দর্শনের ব্যবস্থা হয়। ঠিক হলো, একদিন নিজাম সেটি দেখতে আসবেন।

কর্তৃপক্ষ সব শুনে নিজামের অপমানের কথা ভেবে মাধবকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন।

মাদ্রাজে মাধবরাও সহপাঠীদের সঙ্গে মেসে থাকত। মেসের কাঁচঢাকা টেবিল দেখে একদিন বলল—

মেসের ম্যানেজার কাঁচের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

মাধবের একটি আঘাতেই কাঁচ ভেঙে গেল।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চক্রান্ত চলছে

সরোজ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে যে কোনও ভাবে যদি একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো যায়, তাহলেই রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সুবিধা হবে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এমনিতেই একটা ধর্মীয় মেরুকরণ দেখা দিয়েছে, সেই মেরুকরণকে আরও স্পষ্ট করে রাজ্যে 'গৃহযুদ্ধ' লাগানোর এক সুচারু পরিকল্পনা চলছে। এ এক ভয়ংকর চক্রান্ত। আর এই চক্রান্তের মুখ্য ভূমিকায় যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষমতা দখলের নেশায় তিনি পরাধীন ভারতের মুসলিম লিগের নেতা-নেত্রীদের মতো আচরণ করছেন। প্রতিপক্ষকে হারানোর জন্য তিনি 'তুষ্টিকরণ রাজনীতি' করতে শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের মধ্যে 'ধর্মীয় মেরুকরণ' করার জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে রাজনৈতিক চাল চালতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন সময় তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিতে ওঠে 'গৃহযুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বার বার গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে তিনি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির একটা বাতাবরণ তৈরি করছেন। সিএএ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জেহাদি শক্তিকে মদত দিয়েছেন। তৃণমূল সরকারের পুলিশের সামনে সরকারি বাস, ট্রেন জ্বালিয়ে জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংসের যে নজির রেখেছে জেহাদি শক্তি, তা ১৯৪৬-৪৭ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় 'নোয়াখালি' দাঙ্গার কথা। ধুলাগড়ে হিন্দুদের বাড়ি ঘর ভাঙা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উস্কানিমূলক বক্তব্যে রাজ্যের মাটি রক্তাক্ত। বাঙ্গালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংকটাপন্ন।

রাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের জন্য প্রায়ই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগে কংগ্রেস ও সিপিআইএম। তাদের অভিযোগ, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের কারণেই লোকসভা নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'মুসলমান তোষণ'-এর অভিযোগে সরব হয়েছে বিজেপিও।

এদিকে একতরফা মুসলমান তোষণ করতে গিয়ে রাজ্যের হিন্দুদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে গিয়েছে। শ্রীরামের জয়ধ্বনি শুনলেই তৃণমূলনেত্রী রেগে যাচ্ছেন। 'জয়শ্রীরাম' ধ্বনিতে তাঁর ভীষণ আতঙ্ক। বাধ্য হয়ে তিনি দুর্গা, কালী, শিবের কথা বলতে গিয়ে বিষ্ণু দেবতাকে 'বিষ্ণুমাতা' বানিয়ে দেন। বাধ্য হয়ে দুর্গা পুজোয় প্রতিটি ক্লাবকে ৫০ হাজার টাকা দেন। পুরোহিত ভাতা চালু করেন। কিন্তু এভাবে কি হিন্দু ভোটকে কবজা করা যাবে? এ প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু সেন্টিমেন্ট'কে অপমান করেছেন। ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের পর তিনি মুসলিম ভোটারদের সম্পর্কে বলেন, 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথিও সহ্য করা যায়।' তিনি মুসলমান সমাজকে 'গোরু'র সঙ্গে তুলনা করে ধর্মীয় মেরুকরণকে প্রশ্রয় দেন। এই মুসলমানরা তাঁকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। কিন্তু ২০২১ সালে মুসলমানরা ভাইজান আব্বাস সিদ্দিকি ও আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দিকে চলে যাওয়ায় হিন্দু ভোটের দিকে নজর পড়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোটের ৫০ শতাংশকে নিজের দিকে রাখার জন্য তিনি হিন্দু ঐক্যকে ভাঙতে অতি সুকৌশলে মতুয়া সম্প্রদায়ের দিকে নজর দিয়েছেন। এজন্য তিনি মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। এতো গেল রাজনৈতিক সমীকরণের অঙ্ক। এর পরে চালটি হলো 'বহিরাগত' শব্দ ব্যবহার করে ভারতবাসীকে অপমান করা। ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখা আছে 'আমরা ভারতের জনগণ'। এ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী সকলেই ভারতীয়। কিন্তু বাঙ্গালি ও হিন্দি ভাষীদের আলাদা করতে চাইছেন। তিনি বাঙ্গলার বাইরে থেকে আসা নেতা-নেত্রীদের বহিরাগত তকমা দিয়ে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টকে তুলে ধরে আঞ্চলিকতাবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করছেন। এই বহিরাগত তকমা দিয়ে দেশের 'নিরাপত্তারক্ষী'দের অসম্মান করছেন। কোচবিহারের শীতলকুচিতে ভোট লুট করতে আসা কয়েকজন দুষ্কৃতীকে নিরাপত্তারক্ষীরা শান্তি রক্ষার্থে গুলি করে হত্যা করাকে কেন্দ্র করে করে শুরু করেছেন রাজনীতি। কারা মরেছে— তারা বাঙ্গালি, তারা মুসলমান। কারা মেরেছে— কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তারক্ষীরা— যারা বহিরাগত। এভাবেই তৃণমূলনেত্রী একদিকে যেমন 'বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট', অন্যদিকে তেমনি 'মুসলমান সেন্টিমেন্ট' নিয়ে খেলতে শুরু করেছেন। মিথ্যা অভিনয়কে তিনি সত্যে রূপান্তরিত করেই ছাড়বেন— তাতে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেভাবেই হোক তৃণমূল নেত্রীকে ক্ষমতায় থাকতে হবে। মতুয়াদের ভোট পাওয়ার জন্য বড়মার শরণাপন্ন হয়ে মমতা ঠাকুরকে তৃণমূলের বিধায়ক করেছিলেন। পাশাপাশি বাঙ্গলার নাগরিকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ তৈরি করতে ক্রমাগত নাটক করে চলেছেন। এই 'ড্রামা' কখনও কখনও 'মেলোড্রামায়' পরিণত হচ্ছে। আবার অভিনয়টিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত নিখুঁতভাবে করছেন, যা দেখে বিভিন্ন নাম করা অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও তাঁকে 'গুরু' বলে মানতে ভয় করেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহযুদ্ধ বাধানোর জন্য নানা ছলাকলা পরিকল্পনা যেমন করেছেন, তেমনি ভোটারদের ভয় দেখানোর জন্য 'খেলা হবে' স্লোগান চালু করেছেন। রাজ্যের গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য তিনি ভয়ংকর খেলায় মেতেছেন। স্বৈরাচারী ও অহংকারী এই মহিলা বাঙ্গলায় কোন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, তা সচেতন নাগরিকদের ভাবতেই হবে। বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, বাঙ্গালি-অবাঙ্গালির মধ্যে, উচ্চবর্ণ হিন্দু ও নিম্নবর্ণীয় দলিত মতুয়া সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে ভেদভাব সৃষ্টির খেলায় মেতেছেন। মানুষ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে যেনতেন প্রকারেণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলার ক্ষমতা দখল করতে চাইছেন। এ বড়ো ভয়ংকর খেলা। ◻

ফঃ ৬

গোটা রাজ্যের হিংসার চূড়ান্ত মুখ শীতলকুচি

হীরক কর

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা থানার শীতলকুচি। যাকে নিয়ে সরগরম এখনকার রাজ্য রাজনীতি। চতুর্থ দফার ভোটে শীতলকুচির দুটো পৃথক পৃথক বুথে গুলি চালানোর ঘটনায় মোট পাঁচজন নিহত হন। আহত বেশ কয়েকজন। নির্বাচন কমিশন পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে সিআইএসএফ। এই নিয়ে চ্যানেলে চ্যানেলে তরজা চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর একটা অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। তাতে তিনি বলছেন, সিআইএসএফদের গ্রেপ্তার করাবো। এসপি থানার ওসি কাউকে ছাড়বো না। শেষ পর্যন্ত ওই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিআইডি।

দশ এপ্রিল শীতলকুচি পাঠানটুলিতে ৫/১৮৫ নম্বর বুথে গুলিতে মৃত্যু হয় আনন্দ বর্মন নামে এক যুবকের। এর কিছুক্ষণ পরেই জোড়পাটকি গ্রামের ৫/১২৬ নম্বর বুথের আমতলী এমএসকে সেন্টারে ভোট চলাকালীন কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালে চারজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম, হামিদুল মিয়া, সামিদুল মিয়া, মনিরুল মিয়া এবং নূর আলম। কিন্তু কী হয়েছিল সেদিন?

শুনিয়েছেন ২২৬ নম্বর বুথের ঠিক পাশেই ১১৮ নম্বর বুথের প্রিসাইডিং অফিসার দিলীপ সিংহ রায়। জানান, ১২৬ নম্বর বুথের ঠিক পাশে ১১৮ নম্বর বুথে আমার ডিউটি পড়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে দূরত্ব মাত্র ৩০০ থেকে ৪০০ মিটার। ৯ তারিখ জোড়পাটকি স্পেশ্যাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলে ১১৮ নম্বর বুথে পৌঁছে আমরা আমাদের কাজ করছি। স্থানীয় কিছু যুবক ঘোরাঘুরি করছিল। খবর পেলাম পাশের ১২৬ নম্বর বুথে ঝামেলা চলছে। ওখানে মোট ভোটার ৮০০। এর মধ্যে মুসলমান ভোটার ৬০০। হিন্দু ভোটার ২০০। বুঝতেই পারা যাচ্ছে ক্ষমতার জোর ওখানে কার বেশি। দিলীপবাবুদের ১১৮ নম্বর বুথে ফিফটি ফিফটি প্রায়। তাঁর কথায়, তাই আমাদের এখানে ওরা সুবিধা করতে পারছে নমা। সন্ধ্যে থেকেই খবর আসছিল ওই বুথে ২০০ হিন্দু ভোটারকে ভোট দান থেকে বিরত করতে ভয় দেখানো হচ্ছে। রাতভর আশপাশ থেকে বোমার আওয়াজ পাওয়া গেল।

পরদিন ১০ এপ্রিল ভোর পাঁচটায় ভোটের লাইনে ২০০ মানুষ। মানুষ আন্দাজ করতে পেরেছিলেন পাশের বুথে গণ্ডগোল হলে ভোট দিতে পারব না। তাই সকাল থেকেই লাইনে। সেলফ হেল্প গ্রুপের দিদিরা জানালেন, ওখানে খুব খারাপ অবস্থা স্যার, গণ্ডগোল হবে। ১২৬ নম্বর বুথে সকাল থেকেই যথারীতি হিন্দুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হলো। বিরোধীদের পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, ওখানকার প্রিসাইডিং অফিসার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাহায্য চান। সেক্টর অফিসার কুইক রেসপন্স টিম নিয়ে গেলে বচসা হয়। ৫০-৬০ জনের একটি দল সিআইএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে। মহিলা ও শিশুদের ঢাল বানানো হয়। ঠিক ২০০৭-এর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামের মতো। বাধ্য হয়ে শূন্যে দুই রাউন্ড গুলি করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে হয়। এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হতে শুরু করলে সিআইএসএফ বাহিনীর কমান্ডেন্ট তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। এরই মধ্যে একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে সিআইএসএফ জওয়ানরা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু কে বা কারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে একটা গুজব ছড়িয়ে দেয় যে তাঁদের একটা ছেলেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে। দিলীপ সিংহ রায়ের ভাষায়, আসল ঘটনা ঘটল এবার। মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাইরা বিশাল সংখ্যায় একত্রিত হয়ে দা, কাটারি, বটি নিয়ে সরাসরি বুথে চলে আসে। প্রথমে তারা আশাকর্মী দিদিকে আক্রমণ করে মারধর করে। এরপর বুথের ঠিক সামনের দরজায় দাঁড়ানো রাজ্য পুলিশের লাঠিধারী কর্মীকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেয়। বুথে প্রবেশ করে থার্ড পোলিং অফিসারকে মারতে শুরু করে। প্রিসাইডিং অফিসার বাধা দিতে গেলে তাঁর হাত ভেঙে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় পোলিং পার্সোনালদের বাঁচাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রিফোর্সমেন্ট চলে আসে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, পোলিং পার্সোনালদের সিকিউরিটি এবং জীবন রক্ষা করা ও ইভিএম মেশিনকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রথম এবং সর্ব প্রধান কাজ।

এরপরই বুথে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ানদের সার্ভিস রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। দীলিপবাবুর কথায়, মনে রাখবেন এতো কিছু হয়ে যাচ্ছে গুলি তখনও কিন্তু চলেনি। কেন্দ্রীয় বাহিনী সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এক সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই অবস্থায় ভোটিং মেশিন রক্ষা, পোলিং পাসওয়ার্ডের জীবন রক্ষা, জওয়ানদের আত্মরক্ষার জন্য কুইক রেসপন্স টিমকে গুলি চালাতে হয়। নইলে পরদিন সংবাদমাধ্যমের হেডলাইন হতো, ওদের হাতে ৪ পোলিং অফিসার মৃত। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনো এলাকায় নির্বাচনে উত্তপ্ত হবে কিনা এবং দুষ্কৃতী গতি প্রকৃতি রয়েছে কিনা তা বোঝার অন্যতম লক্ষণ হলো বোমা-গুলি বন্দুক উদ্ধারের পরিসংখ্যান। কিন্তু শীতলকুচির ক্ষেত্রে সেই পরিসংখ্যান কেন প্রশাসনের টনক নড়লো না সেই দিন সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

ভোট বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই দাবি, একাধিক এলাকা উপদ্রুত হলে তার লাগোয়া কোনো একটি এলাকাকে নজরদারির বাইরে রাখা উচিত নয়। রাজ্য পুলিশের কর্তাদের সাফাই, সব বুথকে স্পর্শ কাতর ধরে নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সব বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল। অভিজ্ঞ পুলিশকর্তাদের মতে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঠিক যে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। তথাকথিত এই শান্তিপূর্ণ বুথে যে গোলমাল হতে পারে তা নিয়েও গোয়েন্দাদের কাছে কোনো আগাম খবর ছিল না। যা ১০ এপ্রিল প্রমাণিত। তাই এখন 'শান্তিপূর্ণ' ১২৬ নম্বর বুথ, গোটা রাজ্যের চূড়ান্ত হিংসার মুখ। ◻

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে শ্রীরামের চরিত্র আজও আদর্শস্বরূপ

কোদণ্ড রামস্বামী, অন্ধ্রপ্রদেশ।

ডঃ অনুপম যশ

পুরাণ ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে চারজন রাম প্রসিদ্ধ। রাম মার্গবেয় (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ), রাম জামদগ্ন (পুরাণ মতে, পরশুরাম), রাম রৌহিণেয় (পুরাণ মতে, বলরাম) এবং দাশরথি রাম (বাল্মীকি রামায়ণের)। এঁদের মধ্যে প্রথম জন বাদে শেষ তিন জন বিষ্ণুর অবতার বলে প্রসিদ্ধ হলেও একমাত্র দাশরথি রামই ভগবান বিষ্ণুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পরমেশ্বর রূপে যুগে যুগে পূজিত হয়ে আসছেন। তিনি হলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। তাঁকে পুরুষোত্তম বলা হয়।

ভগবান শ্রীরামের গুণাবলী :

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রাম যদি দেব চরিত্র হতো তাহলে বোধ হয় রামায়ণের গৌরব হ্রাস পেত। রামচন্দ্র মানুষ বলেই রামচরিত এতো মহিমান্বিত। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করে মানুষ করেন নাই, বরং মানুষই নিজ গুণে দেবতা হয়ে উঠেছেন। কোন কোন গুণ নরচন্দ্রমা শ্রীরামের চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে তা আমরা পাই রামায়ণের শুরুতেই। রামায়ণের বালকাণ্ডে, প্রথম সর্গেই, বাল্মীকি-নারদ সংবাদে, তপঃ-প্রভাব-সম্পন্ন বাল্মীকি যখন মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বর্তমান সময়ে এই অবনীমণ্ডল মধ্যে কোন ব্যক্তির চরিত্র অতীব বিশুদ্ধ? কোন ব্যক্তি সর্বভূতের হিতসাধন করেন? কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য? কোন ব্যক্তি প্রজারঞ্জন সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি সমুদয় কার্যেই সমর্থ? কোন ব্যক্তি অন্তঃকরণ বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছেন? কোন ব্যক্তি অসূয়া-পরিশূন্য, অসামান্য-লাবণ্যসম্পন্ন ও জিতক্রোধ? কোন ব্যক্তি সংগ্রামে রোষাবিষ্ট হলে দেবতারাও ভয় পান? কোন ব্যক্তিকে দর্শন করলে মনুষ্য মাত্রের হৃদয়ে এক অপূর্ব প্রীতির উদয় হয়? একথা শুনে ত্রিলোকদর্শী নারদ বলেন এতগুলি অসাধারণ গুণ একাধারে দুর্লভ হলেও ইক্ষ্বাকুবংশ-সম্ভূত এক নরপতি আছেন, যার মধ্যে এই সমুদয় গুণ-সহ আরও অনেক অনন্য সাধারণ গুণ বিদ্যমান। তিনি বশীকৃতান্তঃকরণ, মহাবীর্য, নিরুপম-রূপ-লাবণ্য- সম্পন্ন, ধৈর্যশালী, বিজিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, নীতিশাস্ত্র বিশারদ, বাগ্মী, শ্রীমান, শত্রু সংহারক, মহাবাহু, বিপুলাংশ, কম্বুগ্রীব, মহাপ্রতাপশালী, লক্ষ্মীবান, ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, জ্ঞানসম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, যশস্বী, সমাধিশালী, বিনীতস্বভাব, প্রজাহিতসাধক, সুনিয়ামক, জীবলোকের রক্ষাকর্তা, সনাতনধর্মের সংস্থাপক।

তিনি স্বধর্মের অনুষ্ঠাতা, স্বজন-প্রতিপালক, বেদ-বেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্বেদ পারদর্শী, সর্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব-লোক-প্রিয়, সাধু, বিচক্ষণ, সদাপ্রফুল্ল-হৃদয়, প্রতিভা- সম্পন্ন, মেধাবী, সৌম্যমূর্তি, সর্বত্র-সমদর্শী, সর্ব-পূজ্য, গাম্ভীর্যে সমুদ্র-সদৃশ, ধৈর্যে হিমালয়-সদৃশ, বীর্যে বিষ্ণু-সদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নি-রুদ্র-সদৃশ, ক্ষমাগুণে বসুধা-সদৃশ, দানে কুবের-সদৃশ, সত্যে ধর্ম- সদৃশ।

রামনবমী পালনের তাৎপর্য :

শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অবতার হলেও একেবারে সাধারণ মনুষ্য রূপে সংসারের যাবতীয় পার্থিব-দুঃখ ভোগ করেছেন আমার-আপনার মতো। তাঁর বন্ধুপ্রীতি, তাঁর স্নেহ, তাঁর পিতৃভক্তি যেমন আদরণীয়, তেমনি তাঁর অসহায়তা, তাঁর কান্নাও আমাদের হৃদয়-স্পর্শ করে, তাইতো তিনি আমাদের প্রাণের মানুষ, কাছের মানুষ—পূজনীয়, শ্রদ্ধার্হ, অথচ দূরের দেবতা মাত্র বলে মন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। গার্হস্থ্য প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম, রামকে তারই অবতার করে দেখানো হয়েছে। পুত্র রূপে, ভ্রাতৃ রূপে, পতি রূপে, বন্ধু রূপে, পিতা রূপে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে এবং সর্বোপরি প্রজারঞ্জক রাজা রূপে শ্রীরাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করেছিলেন।

এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন বিশাল-চরিত্র মনুষ্য যে শাশ্বতকালব্যাপী দেবতাতুল্য মর্যাদা পাবেন, যুগ-যুগ ধরে বিশ্ব-সমাজে পূজিত হবেন, বিশ্বলোকের বাণী ও স্মৃতিতে অমলিন হয়ে চিরপ্রবহমান থাকবেন সেকথা বলাই বাহুল্য। যুগযুগান্ত ধরে শ্রীরামের চরিত্র সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শ চরিত্র হয়ে থেকেছে, মানুষকে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শিখিয়েছে। তাই তাঁর জন্মতিথি ভারতবর্ষের মানুষ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হতে দেয়নি।

অবতার রূপে ভগবান রামের জন্ম কাহিনিটি রামায়ণের প্রথম অংশে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। রাবণের পাপে ও অত্যাচারে ত্রিভুবন যখন জর্জরিত হয়ে উঠল, তখন মেদিনী গাভী-রূপ ধারণ করে স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে এইসব অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করে তাঁর আশ্রয় নেন। ইন্দ্র তখন তাঁকে ব্রহ্মার কাছে এবং ব্রহ্মা শিবের কাছে নিয়ে যান। শিব বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যান। বিষ্ণু আশ্বাস দেন যে, রাবণ বধ করার জন্য অযোধ্যাতে দশরথের পুত্র হয়ে তিনি স্বয়ং জন্মগ্রহণ করবেন। সেই মতো তিনি জন্মগ্রহণ করেন দ্বাদশ মাসে চৈত্র নাবমিক তিথৌ নক্ষত্রে অদিতি দৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাকপতিবিন্দুনা সহ প্রোদ্যমানে (রামায়ণ ১.১৮.৮)।

রামনবমী তিথি :

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিটিকেই রামনবমী তিথি বলে পালন করা হয়। এই তিথিতেই পুনর্বসু নক্ষত্রে ভগবান রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই তিথি রামনবমী নামে পরিচিত। রামনবমীর দিন ঠিক মধ্য-দুপুর বা মধ্যাহ্ন কালকে পুণ্য ও পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। মনে করা হয় যে, সম্ভবত এই মধ্যাহ্ন কালেই ভগবান রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই এই তিথি ও কাল সর্বকামপ্রদা। উৎসব পালনের ক্ষেত্রে এই সময়টিতে ভগবানের জন্ম বিষয়ক ভাবনা করা হয়। প্রতি বছর চৈত্র মাসে রাম নবমীর উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

রামনবমী পূজা বিধি :

রাম নবমীর একটি বিশেষ উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। অতএব, এই দিনে উপাসনার নিয়মগুলির বিশেষভাবে পালন করা বিধেয়। এদিন সকালে, সূর্য উদিত হবার আগে উঠা উচিত এবং স্নান করার পরে, উপবাস এবং উপাসনা শুরু করা উচিত। মন্দিরে ঈশ্বরের প্রতিমার সামনে ঘি-এর প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত দেব-দেবীর স্মরণ করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করা উচিত। ভগবান রামের উদ্দেশ্যে ফুল উৎসর্গ করে, মিষ্টি এবং ফল উৎসর্গ করা উচিত। পূজা শেষ করার আগে আরতি করতে হয়।

রাম মন্ত্র সাধক বৈষ্ণবগণের কাছে রামনবমী একটি ব্রত রূপে অবশ্য পালনীয় বলে পরিগণিত হয়। এই তিথিতে উপবাস পালন করে ভগবান রামের পূজা-অর্চনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, বৈষ্ণবগণ অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতে কখনোই উপবাস পালন করেন না, কেবলমাত্র শুদ্ধা নবমী তিথিই উপবাসের পক্ষে প্রশস্ত। রামনবমী ব্রতের দিনে শুধুমাত্র যে ভগবান রামেরই পূজা করা হয়, তাই নয়; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সীতা, দশরথ, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণাদিকেও পূজা-অর্চনা করতে হয়।

রামনবমী তিথির প্রতি প্রহরে পূজা, রাম মন্ত্র জপ ও রাম গীতা পাঠের বিধান আছে। রামনবমী তিথিতে কোনো রাম ভক্তকে ভগবান রামের প্রতিমা দান করলে মহাপুণ্য অর্জন করা যায়। নবমী তিথি পালনের সাথে সারা রাত রাত্রি জাগরণ পূর্বক দশমীতে ব্রতকথা শুনে পালন করার বিধি।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরাম-জন্মোৎসব পালন :

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ভগবান রামচেন্দ্রর জন্মোৎসব দীর্ঘদিন ধরে পালন করা হয়ে থাকে। উত্তর ভারতে তো বটেই, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাম-জন্মোৎসব পালন করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাওড়ার রামরাজাতলায় এই তিথি উপলক্ষে যে পূজা ও মেলার আয়োজন করা হয়, তা প্রায় চার মাস ধরে চলে। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে বিশাল শোভাযাত্রা করে মহা সমারোহে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। হাওড়া জেলার জগাছা থানা এলাকায় ৩০০ বছরের পুরানো রামরাজা মন্দিরে রাম নবমীতে রাম জন্মোৎসব পালন করা হয়। এই পূজায় রামনবমী থেকে শুরু করে, চার মাস ধরে রাম পূজা করার পর শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। ভগবান শ্রী রামের অযোধ্যা দরবারের সমস্ত প্রতিমাই এখানে থাকে। রাম, সীতা ,লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নর সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত হনুমান ও জাম্বুবান, গুরু বশিষ্ঠ, নারদ মুনি, সরস্বতী ও ব্রহ্মা, মহাদেব, পার্বতী, সাবিত্রী, সত্যবান ইত্যাদি সকল প্রতিমাই বিসর্জনের শোভাযাত্রায় দেখা যায়। এর মধ্যে সবথেকে বড় আকারের মূর্তি হলো ভগবান শ্রীরামের মূর্তি। এই মূর্তিটি ২২ ফুট উঁচু এবং ১৬ ফুট চওড়া হয়। এর সঙ্গে আরও ২৬টি প্রতিমা থাকে। এই পূজার ইতিহাস সম্পর্কে ট্রাস্টিরা বলেন স্থানীয় জমিদার অযোধ্যা রাম চৌধুরি ইষ্ট দেবতা হিসেবে রামের পূজা করতেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে জমিদার অযোধ্যা রাম চৌধুরি ও তাঁর অন্যান্য বংশধরেরা মিলে রামের মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

ভারতের বিভিন্ন রাম মন্দিরে শ্রীরাম-জন্মোৎসব পালন :

ভারতের মধ্যে ত্রিশের অধিক সংখ্যক প্রাচীন ও বৃহৎ রামমন্দির আছে তার মধ্যে প্রধান হলো—

১। মধ্যপ্রদেশের **রামরাজা মন্দির।** এটি বেতয়া নদীর তীরে ওরছা শহরে অবস্থিত। রামনবমী তিথিতে গান স্যালুট সহ ভগবান শ্রী রামকে রাজার সম্মানে পূজা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এখানে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম হয়।

২। তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলমে স্থিত **সীতারামচন্দ্রস্বামী মন্দির।** রাম নবমী তিথিতে হাজার হাজার ভক্ত এইদিন রামের জন্মদিন পালন নয়, বরং রাম-সীতার বিবাহ বার্ষিকী উৎসব পালন করেন। এই স্থানের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য হলো এই যে, সীতা উদ্ধারে যাওয়ার পথে গোদাবরী নদী পেরিয়ে এই স্থলে ভগবান রামচন্দ্র এক পর্ণশালায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

৩। তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনম-এ স্থিত **রামস্বামী মন্দির।** রাজা রঘুনাথ নাইকার কর্তৃক প্রায় চারশ বছর আগে এই রাম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। সমগ্র মন্দির ও মন্দির স্তম্ভ জুড়ে রামায়নের ঘটনাবলী চিত্রিত আছে, যা ভক্ত মণ্ডলীর কাছে একটি বড় আকর্ষণ। রামনবমী তিথি মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

৪। মহারাষ্ট্রের নাসিক এর পঞ্চবটী অঞ্চলে স্থিত **কালরাম মন্দির।**

কথিত আছে, এই স্থানে রাম অরণ্যবাস কালে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এবং শূর্পণখার নাসিকা ছেদনের ঘটনাও এই স্থলেই ঘটেছিল। ১৮৭২ সালে সরদার রঙ্গরাও ওধেকর কর্তৃক এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়। দুই সহস্রাধিক শিল্পী ১২ বছরের পরিশ্রমে এই কাষ্ঠনির্মিত মন্দিরটি গড়ে তোলেন। মন্দিরে ভগবান রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের কালো পাথরের মূর্তি বিরাজিত। রাম নবমীতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় ও মহাধূমধামের সঙ্গে উৎসব পালিত হয়।

৫। কেরালার ত্রিশুর জেলায় স্থিত **ত্রিপ্রায়ারাপ্পান মন্দির।** কিংবদন্তি আছে এই মন্দিরের রাম মূর্তিটি অতীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পূজিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মূর্তিটি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বহুযুগ পরে এক ধীবর সমুদ্র তীরে এই মূর্তিটি পুনরায় প্রাপ্ত হন এবং তৎকালীন নৃপতি বাক্কাইল কাইমল এই মন্দিরটি নির্মাণ করে মূর্তিটিকে অধিষ্ঠিত করেন। ভগবান শ্রীরামের মূর্তি এখানে শঙ্খ, চক্র, ধনুক এবং মাল্যধারী। রামনবমী তিথি মহাধূমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

৬। ওড়িশার ভুবনেশ্বরের খারবেল নগরে স্থিত **রাম মন্দির।** এখানে ভগবান শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতামাতার অদ্ভুত সুন্দর প্রতিমা বিরাজমান। সঙ্গে হনুমান, শিব ও অন্যান্য দেবতার মূর্তিও আছে। রামনবমী তিথি মহাধূমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

৭। কর্ণাটকের হীরেমাগালুর শহরে স্থিত **কোদণ্ডরাম মন্দির।** এখানে ভগবান শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তীর-ধনুক নিয়ে যোদ্ধার মূর্তিতে বিরাজমান। রামের ধনুকটি কোদণ্ড নামে পরিচিত। কিংবদন্তী আছে এই মন্দিরের পুরুষোত্তম নামক এক ভক্তের ইচ্ছাপূরণ করতে ভগবান শ্রীরাম সীতার সঙ্গ বিবাহের সাজে তার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রামনবমী তিথি মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

৮। অমৃতসরের বারো কিলোমিটার পশ্চিমে স্থিত **শ্রীরামতীর্থ মন্দির।** কিংবদন্তী এই যে, এটিই সেই স্থল যেখানে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল এবং সীতা মাতা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন ও এখানেই লব কুশের জন্ম হয়েছিল। ভক্তরা এটিকে ভারতের সবথেকে পবিত্র রাম মন্দির বলে গণ্য করেন। রামনবমী তিথি মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

৯। জম্মুতে স্থিত **রঘুনাথ মন্দির।** এটি উত্তর ভারতের সর্ববৃহৎ মন্দির। জম্মু শহরে স্থিত এই মন্দিরটি ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ সালে নির্মাণ করেন মহারাজা গুলাব সিংহ এবং তাঁর পুত্র মহারাজ রণবীর সিংহ। অসংখ্য দেবতার মূর্তি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত, তবে মূল মূর্তি ভগবান শ্রীরামের। রামনবমী তিথি মহাধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

১০। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দ্রাবাদ শহর থেকে ১৫৭ কিলোমিটার দূরের কাকাতীয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ওয়ারঙ্গাল থেকে ৭৭ কিমি দূরে অবস্থিত **রামাপ্পা** মন্দির। এটি **রামলঙ্গলেশ্বর মন্দির** নামেও পরিচিত। যশঙ্কর ভূপালপালী জেলার মুলগ তলুকের মধ্যে এটি ভেনকাতাপুর মণ্ডলের পলমাপে গ্রামের একটি উপত্যকায় অবস্থিত, ১৩ তম ও ১৪শ শতকের গৌরবময় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। মন্দিরের একটি শিলালিপিটি ১২১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই সময় পর্যন্ত রয়েছে এবং কাকতীয় শাসক গণপতি দেবের সময় জেনারেল রিচার্লা রুদ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মন্দির একটি শিবালয়, যেখানে ভগবান রামলিঙ্গার পূজা করা হয়। এটি একটি ৬ ফুট উচ্চ তারকা আকৃতির ভিত্তির উপর মহিমান্বিতভাবে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরটি ভাস্কর রামপ্পা নামে পরিচিত, যিনি এটি নির্মাণ করেছিলেন। ইতিহাস বলে যে এই মন্দির নির্মাণের জন্য ৪০ বছর লেগেছিল। মন্দিরটি কাকতীয়ান সৃজনশীল প্রতিভাধর একটি চমৎকার উদাহরণ, সুন্দর শিল্প সঙ্গে, দেয়াল, স্তম্ভ এবং সিলিং এর শিল্পকলা জটিল করেছে। মন্দিরটির ছাদ (গর্বাসহল) ইট দিয়ে নির্মিত, যা এতটা হালকা যে তারা জলে ভাসতে সক্ষম। ১৭ শতকের মাঝামাঝি একটি বড় ভূমিকম্প হয়েছিল যা কিছু ক্ষতি করেছে মন্দিরটির। রামনবমী তিথি মহাধূমধামের সঙ্গে পালিত হয় এখানে।

১১। **সীতামঢ়ীর রাম মন্দির।** ভারতের বিহার রাজ্যের সীতামঢ়ী জেলার একটি শহর ও পৌরসভা এলাকা। এখানে রামনবমী উপলক্ষ্যে বড়ো উৎসব আয়োজিত হয়।

১২। সবার শেষে নাম করতে হয় **রামজন্মভূমি মন্দিরের**, যা ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যার রামজন্মভূমি তীর্থস্থানটিতে নির্মিত হচ্ছে। মন্দিরটি রামজন্মভূমির পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে; হিন্দুরা স্থানটিকে রামের জন্মস্থান হিসাবে বিশ্বাস করে। এটির নির্মাণকাজ শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অযোধ্যা হিন্দু ধর্মের পবিত্রতম নগরী হিসেবে স্বীকৃত। এই শহরে হিন্দুরা প্রতি বছর তীর্থ করার জন্য এখানে আসেন। অযোধ্যা প্রাণকেন্দ্রে বিতর্কিত রামমন্দির অবস্থিত। রামের জন্মভূমি হিসেবে বিখ্যাত অযোধ্যা শহরে ১০০ মিটার উঁচু রামের মূর্তি স্থাপন করা হবে।

অযোধ্যার আর একটি প্রাচীন মন্দির হলো **কালেরাম-কা-মন্দির।** এটি রামকোট শহরের প্রধান উপাসনাস্থল এবং প্রাচীন শহরের উঁচু ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন দুর্গের স্থান। যদিও সারা বছরই তীর্থযাত্রীরা এখানে দর্শন করে, তবে বিশেষভাবে রাম জন্মের দিন রামনবমী উপলক্ষ্যে এটি বিশ্বজুড়ে ভক্তদের আকর্ষণ করে। তিন শতাব্দী আগে কুলুর রাজা এখানে একটি নতুন মন্দির তৈরি করেছিলেন, যা ১৭৮৪ সালে ইন্দোরের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকার দ্বারা সংস্কার করা হয়েছিল, একই সময়ে সংলগ্ন ঘাটগুলি নির্মিত হয়েছিল। কালো বেলেপাথরের মূর্তিগুলি সরযু নদী থেকে উদ্ধার করে নতুন মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষ ছাড়াও বাংলাদেশে হিন্দুদের মহাতীর্থস্থান ভবানীপুর, বগুড়াতে রামনবমী উপলক্ষে ভক্ত সমাগম হয় ও মেলা বসে।

(লেখক বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক)

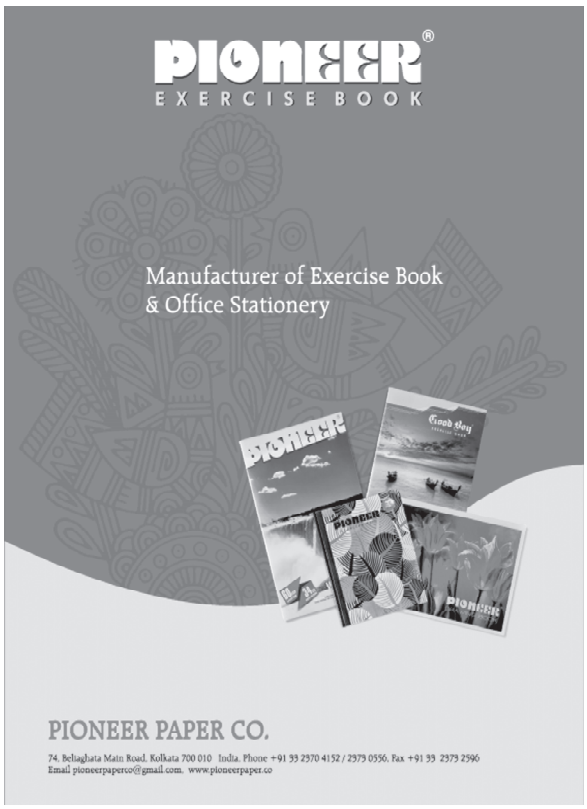

বাঙ্গলার ভোটে বাঙ্গালিয়ানা বনাম ভারতীয়ত্ব

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রদেশ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেকটি রাজ্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—আমরা সকলেই আগে ভারতীয়, তারপর আঞ্চলিক পরিচয়। অথচ ২০২১ এর বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দলটি আঞ্চলিক পরিচয়টিকে অন্তঃসারশূন্য আত্মশ্লাঘায় ভূষিত করে আঞ্চলিকতাবাদকে উসকে নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। উদাহরণস্বরূপ 'জয় বাংলা' স্লোগানটির কথা ধরা যাক। প্রত্যেকটি দেশ বা জাতির একটি জাতীয় স্লোগান থাকে যা ভারতের ক্ষেত্রে 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্' ইত্যাদি। আবার পাকিস্তানের ক্ষেত্রে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। আর আমরা এও জানি, বন্দে মাতরম্ ধ্বনিটি যেমন ভারতের মুক্তি আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছে তেমনি 'জয় বাংলা' স্লোগানটি বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপাতে উজ্জীবিত করেছে। ভারতীয়দের কাছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' যেমন বিজাতীয় তেমনি 'জয় বাংলা' ধ্বনিটিও। ভোটে তৃণমূল নেত্রীর 'জয় বাংলা' স্লোগানটি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করবে না তো? মনে রাখতে হবে, ভোট যতই হিংসাশ্রয়ী হোক, জয় পরাজয় নির্ধারিত হবেই। ফল যতই তেতো হোক তা গিলতে হবে। সুতরাং এমন কাজ এবং বক্তব্য থেকে সকলকেই বিরত থাকতে হবে, যা সমাজজীবনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ভারতের সর্ববৃহৎ জাতীয় দল বিজেপিকে ক্ষমতায় আসতে না দেওয়ার বিষয়ে এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম, বাকি সব রাজনৈতিক দল ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ। আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী বাম-অতিবাম ভাবধারায় লালিত এই বুদ্ধিজীবীরা (যাঁদের কেউ কেউ দেশে-বিদেশে খেতাবপ্রাপ্ত) মনে করছেন নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই ভাষা, সংস্কৃতি, ভারতের ঐতিহ্য এবং সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র আগ্রাসনের মুখে। উদাহরণ—উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষকদের হাতে আখলাখের মৃত্যু, সংসদে তিন তালাক বিল পাশ করে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে হস্তক্ষেপ, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের মাধ্যমে মুসলমানদের ভাবাবেগে আঘাত,

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে আদালতের রায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বিস্তার এবং সর্বশেষে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধ্বংস ইত্যাদি। এর মধ্যে গোরক্ষকদের তাণ্ডব অবাঞ্ছিত এবং একান্তভাবেই আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক। বাকি সব বিষয় কিন্তু বিধিসম্মতভাবে প্রণীত। এগুলি ছাড়াও জিএসটি, নোটবন্দি এবং কৃষি বিল নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ। তবে সংবাদমাধ্যমে কল্পিত, অর্ধসত্য, অপ্রমাণিত এবং কুৎসাশ্রয়ী হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের গল্প লিখে নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করতে গিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদটিকে পর্যন্ত কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস পাড়ার ক্লাবে এবং চায়ের কাপে ঢেউ তুললেও ওয়াকিবহাল মহলে এমনকী বৃহত্তর পাঠক সমাজে ওদের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা তলানিতে পৌঁছাচ্ছে। কারণ ব্যক্তিগত পরিসরে নানা ধরনের সংবাদমাধ্যমের সহজলভ্যতা। তথাকথিত মুক্ত চিন্তার ধ্বজাধারীরা যখন কফি হাউসে 'একটি ভোটও বিজেপিকে নয়' প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে কফির কাপে ঝড় তোলেন তখন কিন্তু সাধারণের প্রশ্ন থাকে কফি হাউসের মতো একটি পাবলিক প্লেসে পক্ষপাতদুষ্ট প্ল্যাকার্ড থাকলে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। বিশ্বায়ন এবং সামাজিক মাধ্যমের সহজলভ্যতার দৌলতে সব খবরই সাধারণের আয়ত্তে। গত দশকে বিশ্বজুড়ে মন্দা এবং বর্তমানে করোনা অতিমারীর প্রকোপে বিশ্বের অর্থনীতি বেসামাল, ভারত তার বাইরে নয়। ১৩৭ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ করোনাকালে খাদ্য সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং টিকা কর্মসূচী রূপায়ণে অর্থ সংগ্রহে পেট্রোল-ডিজেলের এবং রান্নার গ্যাসে দাম বাড়াচ্ছে বাজেট ঘাটতি সামলাতে। অথচ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ সরকারের সমালোচনা করছেন অনৈতিকভাবে। দিল্লি-হরিয়ানা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে হাজার হাজার কৃষক অবস্থান করছেন কাদের উসকানিতে? সরকার নিঃশর্তে আলোচনা চাইলেও আন্দোলনকারীরা শর্ত চাপাচ্ছেন আইন প্রত্যাহারের। তাহলে কি ধরে নিতে হবে কৃষি আইনে কোনো ভালো দিশা নেই?

পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচন বাঙ্গলা-বাঙালি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিয়ে বাকবিতণ্ডা চলছে। তৃণমূল নেত্রীর ভোটে Mascot 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়'—তাহলে কি বাকিরা সব সতীনের মেয়ে? তবে এবারে ভোটে সততার প্রতীক সাইনবোর্ড উধাও। সম্ভবত আমফানে ত্রাণের টাকা চুরি, কয়লা পাচার, গরু পাচার এবং সোনা পাচারে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং কেলেঙ্কারিতে তৃণমূলের নেতাদের জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে আসার পর 'সততার প্রতীক' সাইনবোর্ড তুলে ধরার কর্মীর অভাব ঘটছে। আর এটাই তৃণমূলের আত্মঘাতী গোল। তৃণমূল নেত্রী যতই একপায়ে বাঙ্গলা দখল, আর দু'পায়ে দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখান এবং নিজেকে বাংলার বাঘিনি বলে আস্ফালন করুন, তিনি যে ভোটের ফলাফল নিয়ে শঙ্কিত বা ভীত তা তাঁর অসহিষ্ণু

আচরণেই প্রমাণিত। তাই প্রতিটি সভায় নিজের প্রাণনাশের গল্প ফেঁদে তিনি সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছেন। পঞ্চায়েত ভোটের মতো অরাজকতা সৃষ্টি করে ছাপ্পা ভোটে জেতার পরিকল্পনা ভেসে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন এবং আট দফা ভোটের বিরোধিতা থেকে শুরু করে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্ব, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মাধ্যমে টাকা বিলি এবং ভয় দেখানোর মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নেন নেত্রী। এমনকী, দলের প্রমিলা বাহিনীর দ্বারা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘেরাও করে ভোট দেওয়ার নিদান দেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলশ্রুতি উন্মত্ত জনতার হাতে আক্রান্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে শীতলকুচিতে চার দুষ্কৃতীর মৃত্যু। সম্ভবত, এরকম পরিস্থিতির সুযোগে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির কথা মাথায় রেখেই তুখোর রাজনীতিক তৃণমূল নেত্রী কেন্দ্রীয় বাহিনীকে 'একটু ঘেঁটে দেওয়ার' নিদান দিয়েছিলেন। আবার বহিরাগত (বিজেপির হয়ে) পাড়ায় ঢুকলে তাদের বেঁধে রেখে থানায় খবর দিলে অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে জানালে 'সরকারি চাকুরি পাকা' এই উসকানির ফলে প্রাণ হারাতে হলো বিহার ক্যাডারের পুলিশ অফিসার কিষানগঞ্জ থেকে তদন্তে আসা অশ্বিনী কুমারকে পশ্চিমবঙ্গের পাঞ্জিপাড়ায় (গোয়াল পোখর) মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গোরুদের আক্রমণে। অশ্বিনী কুমারের বৃদ্ধা মা পুত্রের মৃত্যু খবরে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মারা যান এবং দু'জনকেই একই চিতায় দাহ করা হয়। কার পাপে এরকম হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে হলো—জবাব চায় বাঙ্গলা। এরকম ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের কোনো পুলিশ অফিসারের ক্ষেত্রে বা বিহার-উত্তরপ্রদেশে ঘটলে গণতন্ত্রের প্রহরী ভেকধারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কী বলতেন? 'বাংলার গর্ব মমতা' এ বিষয়ে নীরব কেন?

পশ্চিমবঙ্গ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর রাজ্য। নেপাল, ভুটান, চীন, মায়ানমার, বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ, নানা কারণে এই রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটছে—তৃণমূল তার জন্মদাতা না হলেও প্রশ্রয়দাতা—ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতিতে সুবিধা পেতে। অথচ মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশিদের অবিরাম অনুপ্রবেশের ফলে অসম-ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে জনবিন্যাসের ভারসাম্য এবং শান্তি-সুস্থিতি বিঘ্নিত। এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরাই বর্তমান তৃণমূল দলের জিয়নকাঠী। তাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে এত রোষ এবং হিংসাত্মক প্রতিরোধ। অথচ, এই নাগরিকত্ব আইনটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কোনো ভারতবাসীকে স্পর্শ করে না। এটি পড়শি দেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের ভারতের মূলস্রোতে যুক্ত করার ব্যবস্থা। এবারের নির্বাচনে অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদের চাগাড় দেওয়া। এই একই লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার ভেকধারী কলমচি, উগ্র বাম এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে এক মহান ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। এঁরা চান ভারতবর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং পরম্পরাকে ভুলিয়ে, বাহ্যত নব ভারত সৃষ্টির প্রয়াস—যেখানে ধর্ম অচ্ছুত। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে ঋষি অরবিন্দ সকলেই মনে করতেন---আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মই ভারতের প্রাণ এবং অনুপ্রেরণার উৎস। সনাতন হিন্দুধর্মের দর্শন 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' ভারতের বহুত্ববাদী সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করতে সাহায্য করেছে। যাঁরা ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন—তাঁরা ভারতের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন পরজীবী। শিল্প বিমুখ বাঙ্গলায়, শিক্ষায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া বাঙ্গলায় বাঙালি থেকে ভারতীয়ত্বে উত্তরণ না ঘটলে, হাতে থাকবে 'বাড়িতে বসে ফ্রিতে রেশন'। ▯

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

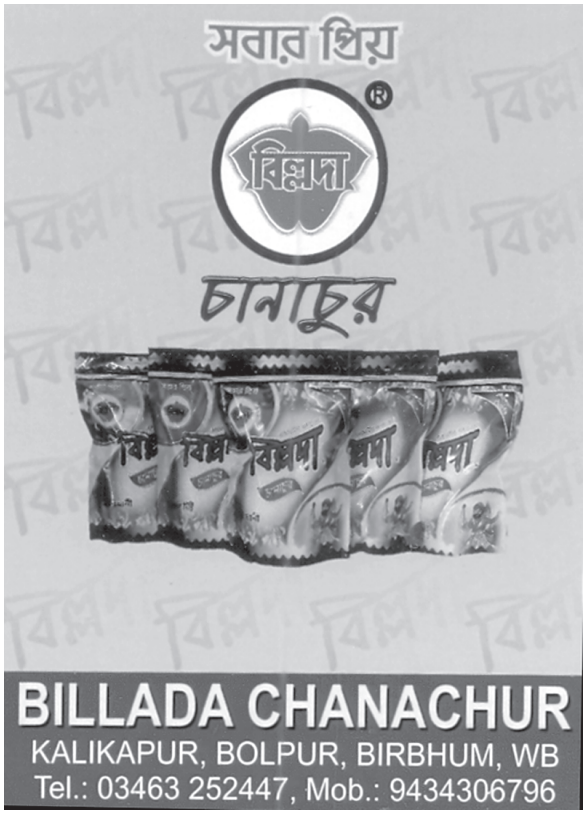

এ রাজ্যের রক্তাক্ত নির্বাচন ও জেহাদি আস্ফালন

ধীরেন দেবনাথ

এবারও এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন রক্তপাত ও মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়েছে। সরকার ও প্রশাসন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলেও রক্ষিত হয়নি সেই গালভরা প্রতিশ্রুতি। আট দফা নির্বাচনের ৫ দফা নির্বাচনেই ঘটেছে রক্তপাত ও হতাহতের ঘটনা। তাই আশঙ্কা করা যেতেই পারে, বাকি ৩ দফা নির্বাচনেও রক্তপাত ও হতাহতের ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখেই সাঙ্গ হবে এবারের বিধানসভা নির্বাচন।

সত্যি বলতে কী, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে রক্তপাতহীন নির্বাচন খুব কমই হয়েছে। '৭৭ সালে কমিউনিস্টদের রাজ্যক্ষমতা দখলের পর ৩৪ বছরের শাসনকালের প্রতিটি নির্বাচনে সিপিএম সায়েন্টিফিক রিগিং ও বুথ দখলের নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলেও তা বিনা রক্তপাত ও জীবনহানি ব্যতিত হয়নি। অতঃপর ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর বিগত দশ বছরের রাজত্বে রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছে শত শত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক, কর্মী ও নেতা। প্রতিটি নির্বাচনে ঘটেছে রক্তপাত ও মৃত্যু। আসলে ক্ষমতালোভী ও মুসলমান তোষণকারী মমতার স্বৈরাচারী ও একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব ও উচ্চাশা তাঁকে নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বনে প্রাণিত করেছে। কিন্তু একদশক রাজত্ব করার পর তৃণমূলনেত্রী এবার পড়েছেন এক কঠিন নির্বাচনী চ্যালেঞ্জের মুখে। তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি, যার কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাছাড়া ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে বিজেপি ছিল নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক, সেই বিজেপিই আজ তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। সেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে তাঁকে। এ যেন বেড়ালছানার বাঘবনে যাওয়া! বিজেপি তাঁর কাছে এক মূর্তিমান 'বিভীষিকা'। অধিকন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের গেরুয়া ব্রিগেডও বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও মুসলমান তোষণকারী তৃণমূল সরকারকে ভোট যুদ্ধে পরাস্ত করে গণতান্ত্রিক, তোষণমুক্ত ও উন্নয়নের সরকার গঠনে বদ্ধপরিকর।

পক্ষান্তরে, তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজয় নিশ্চিত জেনে দিয়েছেন 'মরণকামড়'। নিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন-হত্যার নীতি। তৃণমূল আশ্রিত সমাজ বিরোধী, খুনি, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাশদের নামিয়ে দিয়েছেন তিনি রাস্তা-মাঠ-ময়দানে। আর ওইসব 'সশস্ত্র বাহিনী' নেত্রীর নির্দেশে বিজেপিকে টার্গেট করে চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি কর্মীদের খুন, বাড়ি লুণ্ঠন, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, মিটিং-মিছিল-প্রচারে বাধাদান, সশস্ত্র আক্রমণ, মারপিট খুনের হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শন। পুলিশকে নপুংসক-দলদাসে পরিণত করা হয়েছে। তারাও চালাচ্ছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন। এছাড়াও তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা হারানোর ভয়ে এতটাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন যে তিনি অন্য রাজ্য থেকে ভোট প্রচারে আসা বিজেপি নেতৃবৃন্দ— এমনকী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপি সভাপতি ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকেও বলছেন 'বহিরাগত'। আর তাই যদি হয়, তাহলে তৃণমূলের ভোট ম্যানেজার প্রশান্ত কিশোর, সদ্য তৃণমূলের খাতায় নাম লেখানো যশবন্ত সিনহা, ভাইপো অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা তবে কী? এরাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ ও উদ্বাস্তুরাই বা তবে কী? সবাই বহিরাগত? নেত্রী কি ভাবছেন না, তাঁর এই বহিরাগত তত্ত্ব বুমেরাং হয়ে তাঁর রাজনীতি ও ক্ষমতা দখলের স্বপ্নকে ধ্বংস করতে পারে? কথায় বলে, 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি'। তৃণমূল নেত্রীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। তিনি নির্বাচনী জনসভায় চালাচ্ছেন ভাষা সন্ত্রাস। বিজেপির নেতৃবৃন্দকে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় করছেন গালাগাল, চরিত্রহনন। নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনীও বাদ যাচ্ছে না। এমনকী, দেখে নেওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন।

এবারের নির্বাচনে বুথ দখল, রিগিং, বুথ জ্যাম ইত্যাদির মাধ্যমে ভোটে জিতে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করে ক্ষমতা ভোগ করবেন। কিন্তু তাঁর সেই পরিকল্পনা ও ক্ষমতার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। কারণ বিরোধী দলগুলি বিশেষ করে বিজেপি এ রাজ্যের নির্বাচনী অশান্তি, মারপিট, রক্তপাত, প্রাণহানি, বুথ দখল, রিগিং ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের কথা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করে ৮/১০ দফায় নির্বাচন করানো, নির্বাচনী কাজ থেকে রাজ্য পুলিশকে দূরে রাখা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অধিক সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ এবং বুথ পাহারা-সহ বুথের শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে অর্পণের সুপারিশ করলে কমিশন সবদিক খতিয়ে দেখে প্রায় সব সুপারিশই নেয় মেনে। আর কমিশন ৮ দফার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দায়িত্বের কথা ঘোষণা করতেই তৃণমূলনেত্রী মমতা ফেটে পড়েন ক্ষোভে। তিনি দেখতে পান 'সিঁদুরে মেঘ', শুনতে পান 'অশনি সংকেত'। কারণ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুসারে নির্বাচন হলে তাঁর হার নিশ্চিত। কিন্তু তিনি সহজে হার মানতে নারাজ। তাই তিনি নির্বাচন কমিশনের মুণ্ডুপাত করে তাদের বিজেপির এজেন্ট বলতেও ছাড়েননি। নির্বাচনী জনসভাগুলিতে তিনি স্বয়ং এবং আদরের ভাইপো রাজনৈতিক শত্রু বিজেপির আদ্যশ্রাদ্ধ, নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কুবাক্য প্রয়োগ এবং ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্ষান্ত হননি, 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে তাঁর কর্মী-সমর্থকদের বিরোধীদের রক্তে হোলি খেলতে করেছেন প্ররোচিত। আর তার প্রমাণ রাজ্যের জনগণ পাচ্ছে প্রতিদিন। এ রাজ্য প্রতিদিনই তৃণমূলি হার্মাদদের হাত হচ্ছে রক্তাক্ত। আর সেই রক্তাক্ত পরিবেশে পাঁচ দফা নির্বাচন হয়েছে আরও রক্তাক্ত, আরও বিয়োগান্ত।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
26 April - 2021 - Rs. 12.00
Postal Registration No. KOL RMS/048/2019-2021

- সোনার বাংলায় মহিলারা পাবেন নিখরচায় শিক্ষা, চিকিৎসা, সরকারি পরিবহণে যাতায়াত
- সোনার বাংলায় পিএম-কিষানের আওতায় ৭৫ লক্ষ কৃষকরা পাবেন বার্ষিক ₹১০,০০০ এবং তিন বছরের বকেয়া ₹১৮,০০০
- সোনার বাংলায় প্রতিটি পরিবারের অন্তত ১ জন সদস্যকে কর্মসংস্থানের সুযোগ
- সোনার বাংলায় প্রতিটি পরিবার পাবে টয়লেট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা সহ পাকা ঘর
- সোনার বাংলায় রাজ্য জুড়ে নির্ভয়ে ও বিনা বাধায় সরস্বতী ও দুর্গা পুজা উদযাপন
- সোনার বাংলায় পুরোহিত কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা এবং পুরোহিতদের প্রতি মাসে ₹৩,০০০ সাম্মানিক প্রদান
- সোনার বাংলায় গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে ₹২,৫০০ কোটি টাকার তহবিল
- সোনার বাংলায় চৈতন্য মহাপ্রভু স্পিরিচুয়াল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে তাঁর মতাদর্শ প্রচার
- সোনার বাংলাকে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসাবে গড়ে তুলতে ₹১১,০০০ কোটির সোনার বাংলা তহবিল স্থাপন
- সোনার বাংলায় ₹১০০ কোটি একটি মন্দির পুনরুদ্ধার তহবিল গঠনের মাধ্যমে মন্দির সংস্কার ও মেরামতের কাজ

বাংলায় আসল পরিবর্তন আনতে
নিজের ভোট ← বিজেপিকে দিন

SWASTIKA DIGITAL SWASTIKA DIGITAL swastikadigitalindia@gmail.com
Contact us Chandrachur Goswami :9674585214 Anamika Dey : 9903963088

Published and Printed by Sarada Prasad Paul on behalf of OmSwastik Prakashan Private Limited at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6. Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Rantidev Sengupta. ।। দাম ১২ টাকা।।